KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher: নাহার রহমান
Title: চতুরঙ্গ	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৫১/৯ ৫১/১০ ৫১/১১ ৫১/১২	Year of Publication: পৌষ ১৩৯৭ ॥ Jan 1991 মাঘ ১৩৯৭ ॥ Feb 1991 ফাল্গুন ১৩৯৭ ॥ March 1991 চৈত্র ১৩৯৭ ॥ April 1991 Condition : Brittle Good ✓
Editor: আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ূন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

পরিচয়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৯ জানুয়ারি ১৯৯১

যুক্তি অথবা বিশ্বাস—কোন্‌টি মানুষের অগ্রগতির প্রকৃষ্ট মাধ্যম—এই দুইয়ের ব্যবধান কি সত্যিই দুরতিক্রম্য ? "যুক্তি ও বিশ্বাস" সন্দর্ভে এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছেন অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

ধর্মে, সমাজে, ভাষায় বিবেকানন্দের প্রগতিশীলতা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ লিখেছেন প্রবীণ কবি হরপ্রসাদ মিত্র।

"বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ পর্ব"—এর শেষাংশ।

"পশ্চিমের উত্তর-আধুনিকতা ঃ একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা"—কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের বৈদগ্ধসমৃদ্ধ আলোচনা।

মুসলিম জনসংখ্যা কি বাড়ছে ? তাদের "চার-বিয়ে আর অগুনতি বাচ্চা"—এই প্রচারের মূলে বাস্তবতা কতখানি ? এই নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান করেছেন প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতের কৃষক আন্দোলনের ধারা এবং মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ড. সুনীল সেনের একটি বইয়ের বিস্তারিত আলোচনা।

"ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতীয় রূপ"—এই প্রসঙ্গে তর্কসাপেক্ষ বিস্তারিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন বেণু গুহঠাকুরতা।

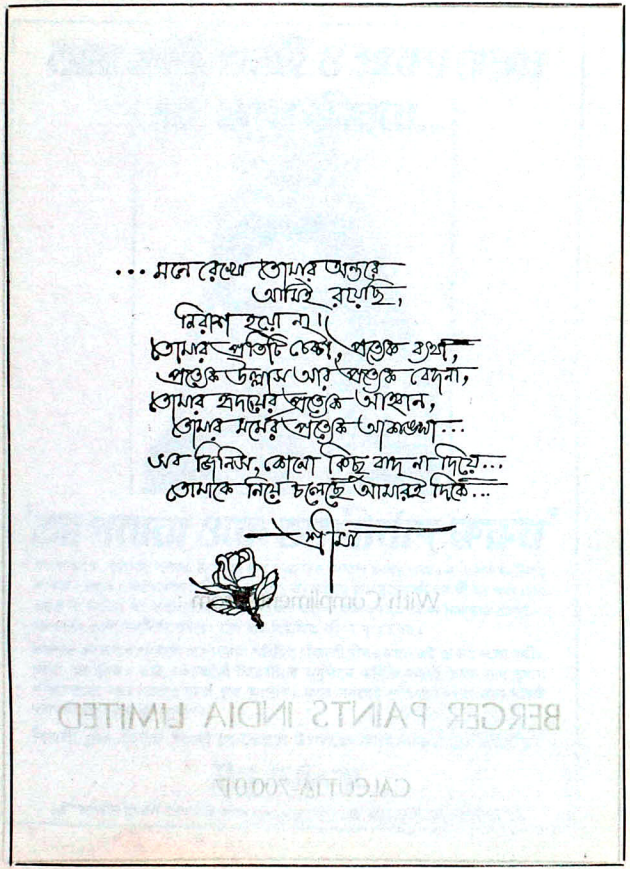

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৯
জানুয়ারি ১৯৯১
পৌষ ১৩৯৭

যুক্তি ও বিশ্বাস অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৬৬৯
বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষপর্ব আজহারউদ্দিন খান ৬৮১
ধর্মে, সমাজে, ভাষায় প্রগতিবাদী বিবেকানন্দ হরপ্রসাদ মিত্র ৬৯৪
মুসলিম জনসংখ্যা কি বাড়ছে? প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৭২১

জীবন-অয়ন অরুণা হালদার ৬৭৬
চতুর্থ ভুবনে সমীহ সামসুল হক ৬৭৮
দ্রোহীদিন শৌনক বর্মন ৬৭৯
একদিন হবে কবিরুল ইসলাম ৬৮০

সকাল রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ৬৮৮

গ্রন্থসমালোচনা ৭০৬
পুলকনারায়ণ ধর, সুজিৎ ঘোষ, রণেন্দ্রনাথ দেব, সুব্রত সরকার

বিশ্বসাহিত্য ৭৪৩
পশ্চিমের উত্তর-আধুনিতা প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

মতামত ৭৫১
বেণু গুহঠাকুরতা

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

WITH COMPLIMENTS FROM

INDIAN CAN PRIVATE LIMITED

6, MIDDLETON STREET
CALCUTTA-700071

Telephones : 29-2306
29-2307

যুক্তি ও বিশ্বাস

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

আধুনিক দৃষ্টিতে যুক্তি ও বিশ্বাসের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে এবং আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হিসাবে সাধারণত বিবেচিত হয় সেই জীবনধারা, যা বিশ্বাসের আকর্ষণ এড়িয়ে আশ্রয় নেয় যুক্তির জগতে। এই আধুনিকতার অপর নাম বিজ্ঞানমনস্কতা। যুক্তিবাদী বিজ্ঞান তার ভাবনা ও ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্র থেকে বিশ্বাসকে নির্বাসন দেয়, স্বভাবতই তার বিচারের মানদণ্ডে যে-কোনো বিশ্বাসলব্ধ সত্যই অবাস্তব ও মূল্যহীন। অন্য দিকে এই বিশ্বাসলব্ধ সত্যই ধর্মের মর্মবাণী। ধর্মের বিচারে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত যে সত্য, তা সত্য নয়, অথবা তা নিতান্তই খণ্ড সত্য ; একমাত্র বিশ্বাসের অতীন্দ্রিয় লোকেই সন্ধান মেলে পূর্ণ ও পরম সত্যের। ধর্ম এই বিশ্বাসনির্ভরতার শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়, তাই ধর্মের প্রবক্তরা অকপটে স্বীকার করেন—'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর'।

যুক্তি ও বিশ্বাসের পরস্পরবিরোধী পটভূমিতে বিজ্ঞান ও ধর্মের এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দিনের। আজও এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয় নি এবং সম্ভবত আগামী দিনেও হবে না। এই কারণেই বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ আধুনিকতা এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। এখনও তাই যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্কদের অনেকেই বিশ্বাস-নির্ভর ধর্মের দাবির কাছে অসহায় বোধ করেন এবং কেউ-কেউ ধর্মবিশ্বাসের টানে যুক্তির প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখতে না পেরে লাঞ্ছিত হন স্ববিরোধিতায়। বিজ্ঞান ও ধর্মের এই নিত্য টানাপোড়েনের পরিণামে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা বিভ্রান্ত বোধ করি তা হল এই যে, মানবজীবনে যুক্তি ও বিশ্বাসের ভূমিকা কী? অর্থাৎ, যুক্তি অথবা বিশ্বাস কোন্‌টি মানুষের প্রগতিলাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম, এবং যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে প্রকৃতই যদি ব্যবধান থাকে তবে সে ব্যবধান সত্যই দুরতিক্রম্য কি-না। এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

দুই

মানবজীবনে বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে যুক্তির আগে এবং মানুষের দুর্বল ও অসহায় মনোভূমিতেই বিশ্বাসের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ যখন তার দেহশক্তি ও মননশক্তির সম্মিলিত প্রয়োগে পটু হয়ে ওঠে নি, তখন প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যসংগ্রামে বারে-বারে পশ্চাদপসরণ ও পরাভবই ছিল তার জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপুলা প্রকৃতির মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই সে দুর্বল ও বিপন্ন বোধ করেছে। অথচ ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রাণিজগতে তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে শুরু করেছে। প্রকৃতির হাতে পদে-পদে পরাজয় স্বভাবতই এই স্বাতন্ত্র্যের অহংকারে ছিল এক বড়ো আঘাত। অনন্যোপায় মানুষ এই আঘাতের বেদনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে কালক্রমে কতকটা নিজের অজ্ঞাতেই এক বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়, প্রকৃতিজগতে যা-কিছু তার কাছে অজ্ঞেয় বলে মনে হয় তাতে সে আরোপ করতে থাকে রহস্যময়তা ও দেবত্ব। এই আরোপিত দেবত্বের সবটাই ছিল তার দুর্বল মনের কল্পনা মাত্র। কিন্তু অন্তরের আকুতির ছোঁয়ায় যতই এই কল্পনা সবল হয়ে উঠতে থাকে, ততই তা একটা স্থায়ী ধারণার আকার নিতে থাকে এবং যে মুহূর্তে এই স্থায়ী ধারণা ব্যক্তিমানুষের মরণশীল জীবনের সীমানা পার হয়ে নির্দিষ্ট এক মানবগোষ্ঠীর চলমান জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তে তা রূপান্তরিত হয় বিশ্বাসে। এইভাবে মানবমনের বিশ্বাস একদিন জন্ম নিয়েছিল মানুষেরই দুর্বলতা ও ব্যর্থতার গর্ভ থেকে, এবং যেহেতু এই বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণরূপে কল্পনানির্ভর সে কারণে এর অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতায় ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনো অবদান ছিল না। স্বভাবতই সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে যখনই মানুষ কঠোর বাস্তবের ব্যাখ্যায় অক্ষমতা বোধ করেছে তখনই তার বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে এই বাস্তবকে সে গ্রহণ করেছে এক বিচিত্ররূপে।

সৌভাগ্যক্রমে মানুষ কালক্রমে মুক্ত হতে পেরেছে তার এই বিশ্বাসের বন্ধন থেকে। তার জীবনের দুর্বার গতিই তাকে নিত্য নতুন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফলত ক্রমশই বিস্তৃত হয়েছে তার অভিজ্ঞতার পরিধি, প্রখর হয়েছে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং উন্নত হয়ে উঠেছে তার বোধশক্তি। এই পরিবর্তিত অবস্থায় সে নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছে, এই শক্তি প্রয়োগ করতে শিখেছে প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, এবং জগৎসংসারের কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পেরেছে। যে মুহূর্তে নিজের জীবনে তথা বিশ্বজীবনে মানুষ এই কার্যকারণসম্পর্কের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে, সেই মুহূর্তে তার সামনে এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে গেছে এবং এই জগৎই হল যুক্তির জগৎ। অতএব যুক্তি হল সেই অনন্য মানবিক মননশক্তি যা বিশ্বচরাচরে কোনো রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিটি বস্তু, বিষয় অথবা ঘটনার পিছনে জাগতিক কারণের অবদান মেনে নিয়ে মানুষ তার এই দাবি প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় যে জগতে যা কিছু তার ইন্দ্রিয়গোচর তা-ই তার জ্ঞানগোচর, পক্ষান্তরে যা তার ইন্দ্রিয়গোচর নয় এবং যার অস্তিত্ব যুক্তির ঊর্ধ্বে তা নিতান্তই অলীক হিসাবে উপেক্ষণীয়। বস্তুত, এই যুক্তির সাযুজ্যেই ক্রমাগত পরিবর্ধিত হয়ে চলেছে মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা এবং এ পর্যন্ত মানব-সভ্যতার যে বিস্ময়কর অগ্রগতি তা অর্জিত হয়েছে এই যুক্তির পথ ধরেই।

বিশুদ্ধ যুক্তি সম্পূর্ণরূপে নীতিনিরপেক্ষ, মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ, আপসহীন ও কখনও-কখনও নির্মম। যেহেতু নির্ভেজাল যুক্তি কোনো পূর্বানুমান, কল্পিত ধারণা অথবা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়, সে কারণে তার প্রয়োগের পরিণামে মানুষ এমন অনেক সত্য বা তথ্যের সন্ধান পেতে পারে যা স্পষ্টতই অপ্রিয় অথবা ব্যক্তি ও সমাজজীবনের স্থিতিশীলতার পক্ষে যা সবিশেষ বিপজ্জনক। এই বিশুদ্ধ যুক্তির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রূপে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন প্রাচীন গ্রীসের সফিস্ট দার্শনিকেরা, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার গৌরবপর্বে যাঁদের উদ্ভব। সফিস্টরা আগ্রহী ছিলেন শুধু নিরাসক্ত যুক্তিচর্চায়, অর্থাৎ, কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাসের বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে যুক্তিপ্রয়োগে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। যুক্তির স্বাভাবিক পরি-

ণতিকেই তাঁরা অমোঘ বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাই মুক্ত মনে যুক্তির কঠিন পথ ধরে যেতে-যেতে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত দেখা দেবে তাকেই তাঁরা দিয়েছিলেন সত্যের স্বীকৃতি। এর ফলে সমকালীন সমাজের আপাতরমণীয় রূপে সফিস্ট দার্শনিকেরা আকৃষ্ট হন নি। যুক্তির আঘাতে প্রচলিত ধারণা-ভাবনাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে তদানীন্তন গ্রীক সমাজে সামাজিক সুবিচারের কণ্ঠরোধ করেছে ক্ষমতাশালীর উদ্ধত আচরণ। এই-ভাবে বিশুদ্ধ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে সফিস্টরা এক বিস্ময়কর র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন যা তাঁদের রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে ছিল একান্ত বিপজ্জনক। নির্দয় যুক্তি তাঁদের আরও বিপজ্জনক করে তুলেছিল এই অর্থে যে তাঁরা কোনো চিরন্তন সত্য বা সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ সূত্রের সত্তাব্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, যেহেতু বিশুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের কোনো অবকাশ নেই, সে কারণে যুক্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার কাছে নিঃশর্ত আনুগত্য একজন ব্যক্তিকে যে চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছে দেবে তা-ই তার কাছে সত্য, এবং যেহেতু যুক্তির ধারা পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের কোনো সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে না সেইহেতু এক ব্যক্তির কাছে যা সত্যরূপে প্রতিভাত, আর-এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা সত্যের স্বীকৃতি না-ও পেতে পারে। অতএব ব্যক্তিই হল সত্যবিচারের মানদণ্ড। অর্থাৎ, চিরন্তন বা বিশ্বজনীন সত্য বলে কোনো কিছু নেই, সত্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনির্ভর।

সত্য এইভাবে বিশ্বজনীন না হয়ে যদি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়, তাহলে সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে তা বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সমাজ চলে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ এই নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্যকে আবশ্যিক হিসাবে গণ্য না করে যদি বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজ-নিজ বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী এই আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে থাকে, তাহলে সমাজের সাধারণ নিয়মগুলি অচল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ, যে-কোনো ধরনের সামাজিক কর্তৃত্বের ক্রিয়াশীলতাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার পরিণাম নিঃসন্দেহে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। এই কারণেই সফিস্ট দার্শনিকদের প্রবর্তিত বিশুদ্ধ ও মুক্ত যুক্তিবাদের গতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সফিস্ট তত্ত্ব প্রচারের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, এবং তাত্ত্বিক পর্যায়ে এই কাজের সূচনা করেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। সফিস্ট দর্শনের বিরোধিতা প্লেটোর অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও সফিস্টদের মতোই তিনি যুক্তিকে সত্য প্রতিষ্ঠার মূল মাধ্যম রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর সবত্বেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যুক্তির পথ ধরে।

তবে প্লেটোর যুক্তিনির্ভরতা সফিস্টদের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন যুক্তির। অর্থাৎ, সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ধারণা বা বিশ্বাসকে সত্য রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য যুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন প্লেটো। এর ফলে সফিস্টদের প্রচারিত চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পরিত্যক্ত হয়, সত্যের স্থায়ী ও বিশ্বজনীন রূপ মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে এবং সমাজ-সুরক্ষার স্বার্থে সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ নিয়ম ও সূত্রের প্রণয়নে সব বাধাই দূর হয়ে যায়। কিন্তু একই সঙ্গে ব্যাহত হয় যুক্তির স্বাভাবিকতা ও স্বাতন্ত্র্য। বিশুদ্ধ ও মুক্ত যুক্তির পথ পরিহার করে প্লেটো প্রবর্তন করেন নিয়ন্ত্রিত যুক্তির, অর্থাৎ, তাঁর দ্বারাই সর্বপ্রথম শুরু হয় যুক্তির প্রয়োজনানুগ ব্যবহার যার জন্য একালের দার্শনিক বারট্রানড রাসেল প্লেটোকে চিহ্নিত করেছেন এক দার্শনিক পাপাচারের প্রথম প্রবক্তা রূপে। রাসেলের এই নিন্দাবাদ অবশ্যই অসঙ্গত নয়, কারণ

যুক্তিকে সত্যের স্বার্থ-নিরপেক্ষ অন্বেষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করে তাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে প্লেটোই প্রথম শিখিয়েছিলেন। তবে যুগ-যুগ ধরে প্লেটোর এই শিক্ষাই শিরোধার্য করেছেন সকলে, প্লেটো-পরবর্তী সমস্ত দার্শনিক ও চিন্তাবিদই যুক্তি প্রয়োগ করেছেন নিজেদের স্থিরীকৃত ধারণার সত্যতা ও বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে। অন্য দিকে মানবসভ্যতার যে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, তার পিছনেও লক্ষ করা যায় প্লেটো-প্রবর্তিত এই নিয়ন্ত্রিত যুক্তির ব্যাপক সক্রিয়তা। তাই আজকের পৃথিবীতে বিশুদ্ধ যুক্তির কোনো স্থান নেই। বস্তুত, নিছক যুক্তির জয় আজ কোনো মানুষের কাছেই অন্তিম লক্ষ্য রূপে বিবেচিত হয় না, তার কাছে যুক্তি হল পূর্বনির্দিষ্ট কোনো-না-কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর একান্ত নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

তিন

বিশুদ্ধ যুক্তির স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য, তার সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে যুক্তি কোনো ধরনের পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা বা উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই মুহূর্তে তার বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে; কারণ এই ধারণা বা উদ্দেশ্যের উৎসমূলে প্রেরণা যোগায় কোনো এক ধরনের বিশ্বাস। অতএব আধুনিক মানবসমাজে যে যুক্তির প্রাধান্য সম্পর্কে আমরা গর্ববোধ করে থাকি তা অবিমিশ্র যুক্তি নয়, তা হল বিশ্বাসনির্ভর যুক্তি। যুক্তির ক্রিয়াশীলতা যদি এইভাবে বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে স্বভাবতই যুক্তির মূল্য ও মহিমা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে; মনে হতে পারে যে আমাদের সব বিজ্ঞান-মনস্কতা, আধুনিকতা ও যুক্তিনিষ্ঠাই মেকি, কারণ এসব কিছুর মধ্যেই রয়ে গেছে বিশ্বাসের পিছুটান। তবে এই সন্দেহ ও ধারণা প্রকৃতপক্ষে অমূলক। কারণ যুক্তি ও বিশ্বাস সম্পর্কে এই নিবন্ধের শুরুতেই যে দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। যুক্তি ও বিশ্বাসের দুই জগৎ অবশ্যই স্বতন্ত্র, তাদের মধ্যে সম্পর্কও বিরোধিতার। কিন্তু এই বিরোধিতা চরম বৈরিতা নয়। বিশ্বাসের অনড় বেদিতে চরম আঘাত হানাই যুক্তির কাজ এবং এই কাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয় তার চরিত্র। আবার অনেক সময় এই আঘাত হানার উপযুক্ত শক্তি যুক্তি আহরণ করে বিশ্বাসেরই কাছ থেকে। অন্যভাবে বলা যায় যে বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই যুক্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ, যুক্তি ও বিশ্বাসের পারস্পরিক সম্পর্ক একদিকে সংঘর্ষের এবং অন্যদিকে সহযোগিতার। এই বিচিত্র সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বাসের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কল্পনা ও কল্পনাশ্রিত অনুমানে জারিত হয়েই বিশ্বাস সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল মানবমনে এবং মানুষের ব্যর্থতা ও দুর্বলতার ফাঁক পূরণের জন্যই এই বিশ্বাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের বিশ্বাসের দাসত্ব মানুষের জীবনে এক চরম অভিশাপ। কারণ এর দ্বারা ব্যাহত হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, তার চিন্তা নির্দিষ্ট এক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা হারায়। সভ্যতার প্রথম প্রহরে এই বিশ্বাসের উদ্ভব হলেও এবং তারপর বহু শতাব্দী ধরে মানুষ তার বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে অশেষ কীর্তি স্থাপন করলেও আজও মানুষ এই বিশ্বাসের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে নি। পারে নি তার কারণ এখনও নিজের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে সে অস্বীকার করতে পারে না, এখনও সে সর্বত্র সফল ও অজেয় নয়, এবং এই জন্যই বারে-বারে যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসকে সে আঁকড়ে ধরে। বস্তুত, আজকের বিশ্বসংসারে যা কিছু বিপদ, বিশৃঙ্খলা, অন্যায় ও অপরাধ তার অনেকটাই এই বিপজ্জনক প্রবণতার পরিণামে। তাই দেখা যায় যে নিজেদের জীবনচর্যায় যথেষ্ট আধুনিক ও প্রাগ্রসর হয়েও এখনও আমরা অনেক সময় আমাদের কল্পিত ধারণা ও বিশ্বাসকে কঠোর যুক্তি ও সঠিক তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নে এবং বিশ্বাসের নামে বরণ করে নিই মতান্ধতাকে। এই মতান্ধতায় আচ্ছন্ন হয় আমাদের বিচারবোধ, নিজেদের বিশ্বাসের উৎকর্ষ ও যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে আমরা উন্মত্ত আঘাত হানি অন্যের বিশ্বাসে। এইভাবে বিশ্বাসের অন্ধকারে জন্ম নেয় আগ্রাসনের এক ভয়ার্ত পরিবেশ যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কলুষিত হয় বিদ্বেষ ও বৈরিতায়, এক জনসম্প্রদায় আর-এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে লিপ্ত হয় হানাহানিতে। আবার যে সমাজে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অচলায়তনে আবদ্ধ, সেখানে বিশ্বাসই মানুষের মূল আশ্রয়, তার জীবন-গতির অমোঘ নিয়ন্তা, তার সর্ববিধ বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। এই ধরনের সমাজ ও তার রাজনীতিতে ক্ষণে-ক্ষণে তাই দেখা দেয় অশান্তি, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। সন্দেহ নেই, এ বিষয়ে আমাদের দেশ ভারতবর্ষই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন, কল্পনানির্ভর অথবা অনুমাননির্ভর বিশ্বাস অবশ্যই সর্বতোভাবে বর্জনীয়। একে আমরা চিহ্নিত করতে পারি আত্মশক্তিতে আস্থাহীন আদিম মানুষের বিশ্বাস রূপে, কর্মশক্তিতে উজ্জীবিত আধুনিক জীবনে যার কোনো স্থান হতে পারে না। কিন্তু এ ছাড়াও মানবজীবনে আর-এক ধরনের বিশ্বাসের সক্রিয়তা লক্ষ করা যায় যার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাযুজ্যে বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে মানুষ যেসব তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির সমাহারে গড়ে ওঠে তার অভিজ্ঞতা। আবার যুক্তির মাপকাঠিতে এই অভিজ্ঞতার সত্যতা ও যাথার্থ্য বিচার করে এবং কখনো-কখনো এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ গড়ে তোলে বিভিন্ন ধারণা যা মানবসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত ধারণা রূপে। জন্মসূত্রে এ ধারণা একান্তভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তির ওপর নির্ভর-শীল হলেও এর দেশ-কালোত্তীর্ণ, ব্যাপক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত বিশ্বাসেরই সহায়তায়। অর্থাৎ, যিনি সর্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সমন্বয়ে একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর ক্ষেত্রে বিশ্বাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না থাকলেও বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের লক্ষ-কোটি মানুষ যখন বিনা প্রশ্নে এই ধারণাকে অভ্রান্ত রূপে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দেয় তখন কার্যত তারা প্রভাবিত হয় বিশ্বাসের দ্বারা। যেমন, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর নিত্য আবর্তন সম্পর্কিত ধারণা একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগে। কিন্তু আজ সাধারণ মানুষ যখন কোনো রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এবং তার নিজস্ব যুক্তির কষ্টিপাথরে কোনো যাচাই না করেই এই চিরায়ত ধারণাকে পরম সত্য রূপেগ্রহণ করে, তখন প্রকৃতপক্ষে সে এক ধরনের বিশ্বাসের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে বিশ্বাসে নিষিক্ত হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি আমরা অকুণ্ঠ আনুগত্য জানাই। একই ভাবে যেসব নৈতিক অনুশাসনকে আমরা চিরন্তন রূপে গণ্য করে থাকি সেগুলির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের মূল ভিত্তি হল আমাদের বিশ্বাস। যেমন, সত্য ভালো ও মিথ্যা মন্দ, সততা পালনীয় ও শঠতা বর্জনীয়—ইত্যাদি যে মৌলিক নৈতিক সূত্রাবলীর দ্বারা মানবজীবন সাধারণত নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলিকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মর্যাদা দিয়ে থাকি। অর্থাৎ, এইসব নৈতিক নিয়মের সত্যতাকে আমরা স্বীকার করে নিই আমাদের অন্তরের বিশ্বাস দিয়ে, মস্তিষ্ক-চালিত যুক্তি প্রয়োগ করে তাদের বিচারে আমরা আদৌ প্রবৃত্ত হই নে।

তবে এই বিশ্বাস আত্মশক্তি-সচেতন আধুনিক মানুষের—ভীত ও সন্ত্রস্ত আদিম মানুষের নয়। স্বভাবতই এর চরিত্র ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। বস্তুত, আপাতদৃষ্টিতে এই বিশ্বাস যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন

বলে মনে হলেও প্রকৃত বিচারে যুক্তির সঙ্গে অবশ্যই তার এক যোগসূত্র আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রকে আমরা যখন অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করি তখন এই বিশ্বাসের পিছনে কাজ করে আমাদের যুক্তিনির্ভর বিবেচনা। যে যুক্তিনিষ্ঠ অনুসন্ধানের জটিল পথ ধরে এই সূত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল তার মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা স্বভাবতই সাধারণ মানুষের নেই। তথাপি এই সূত্রের সত্যতা আমরা বিশ্বাস করি এই বিবেচনার উপর নির্ভর করে যে নিতান্ত বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ উপায় অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সত্য। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক সত্যে যে অকুণ্ঠ বিশ্বাস আমরা আরোপ করি তা বিশুদ্ধ বিশ্বাস নয়, তা প্রকৃতপক্ষে যুক্তিগামিতার উৎকর্ষ সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় প্রত্যয়ের প্রকাশ এবং এই বিচারে এই বিশ্বাস নিঃসন্দেহে যুক্তিনির্ভর। একই ভাবে যেসব নৈতিক অনুশাসনের চিরন্তনতায় আমরা বিশ্বাসী সেগুলির প্রতি আমাদের আনুগত্যের ভিত্তি নিছক আবেগ, কল্পনা অথবা অনুমান নয়। মানবজীবনের তথা মানব-সমাজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই নৈতিক সূত্রাবলীর সত্যতা বারে-বারে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে—এই যুক্তিসিদ্ধ ধারণাই আমাদের এগুলিকে মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করে। অতএব নৈতিক জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে যে স্থায়ী বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়ে থাকি যেখানেও লক্ষ করা যায় যুক্তির সক্রিয়তা।

চার

কাজেই দেখা যাচ্ছে আদিম মানবজীবন শুরু হয়েছিল যে বিশ্বাসকে আশ্রয় করে তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি-নিরপেক্ষ বাস্তববিমুখ এক বিমূর্ত ভাবনা হলেও আধুনিক জীবনে ভিন্নতর এক বিশ্বাস সতত ক্রিয়াশীল যা মূলত যুক্তিনির্ভর এবং অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অতএব মানুষের বিশ্বাস দুই ধরনের এবং এদের অভিহিত করা যায় প্রাচীন বিশ্বাস ও আধুনিক বিশ্বাস নামে। যুক্তিহীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রাচীন বিশ্বাস মানুষকে মোহান্ধ ও মতান্ধ করে, তার মনের সংকীর্ণতা বাড়ায়, তার গতিশীলতাকে ব্যাহত করে এবং কখনো-কখনো তাকে অনুপ্রাণিত করে সর্বনাশা কর্মকাণ্ডে। অন্যদিকে যুক্তির আলোকে প্রোজ্জ্বল আধুনিক বিশ্বাস মানুষকে জড়তা ও সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগায়, তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, তাকে উদ্বুদ্ধ করে অগ্রগমনে ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগে। বস্তুত, সভ্যতার এযাবৎ যে অগ্রগতি ঘটেছে তার পিছনে এই যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসের অবদান নিতান্ত কম নয়। এই বিশ্বাসে প্রাণিত হয়েই মানুষ সর্বাগ্রে স্থির করে নিতে পেরেছে তার লক্ষ্য ও আদর্শ এবং এই লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে রেখে বিজ্ঞানী রত হয়েছেন তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে, শিল্পী আত্মনিয়োগ করেছেন নব-নব সৃষ্টিশীল উদ্যোগে, সমাজপ্রেমিক তথা বরেণ্য দেশনায়কেরা প্রণয়ন করেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রকল্যাণের ইতিবাচক কর্মসূচি। অতএব আধুনিক জীবনে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে, যুক্তিলব্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে নয়। বিশুদ্ধ যুক্তি যেমন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অচল, তেমনই বিশুদ্ধ ও স্বনির্ভর বিশ্বাস ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের খাদ মেশাতে না পারলে আধুনিক জীবনে তার কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই, আবার বিশ্বাস যদি যুক্তির নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে তাহলে তা হয়ে ওঠে নিছক অকল্যাণের অনুচর। কাজেই যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের পথই হল শ্রেষ্ঠ পথ।

তত্ত্বগত স্তরে সাধারণত অনুমান করে নেওয়া হয় যে যুক্তি তার চরিত্রানুসারেই সতত নির্দোষ, অর্থাৎ, যুক্তির পথ সব সময়েই শুভ ও মঙ্গলদায়ক। কিন্তু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে এই অনুমান

অভ্রান্ত নয়। মনে রাখতে হবে যে যুক্তির প্রকৃত পরিচয় ও সার্থকতা তার নির্ভুল প্রয়োগে। অতএব যুক্তির প্রয়োগপ্রক্রিয়া যদি আগাগোড়া সৎ ও শুভ চেতনার দ্বারা চালিত না হয়, তাহলে যুক্তি হয়ে ওঠে সর্বনাশের দিশারি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশুদ্ধ যুক্তির প্রবক্তা সফিস্ট দার্শনিকেরা যুক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন সর্বপ্রকারের নীতি ও মূল্যবোধনিরপেক্ষ রূপে। কিন্তু সমাজ সংসার পরিচালনায় এই বিশুদ্ধ যুক্তির কোনো কার্যকারিতা নেই, কারণ যুক্তি যদি লক্ষ্যহীন হয় অথবা তা যদি নৈতিক বিচারে নিন্দনীয় লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তার পরিণাম কখনও শুভ হতে পারে না। অর্থাৎ, যুক্তি আপনা-আপনি শুভ ও সুন্দর হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা অর্থহীন, একমাত্র সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তিই তাকে দেয় কল্যাণকর রূপ। দুর্ভাগ্য-ক্রমে মানুষ যতই সভ্য ও আধুনিক হয়ে উঠছে ততই তার আচরণে ও জীবনচর্যায় উপেক্ষিত হয়ে চলেছে এই কঠিন সত্য। আধুনিকতা আমাদের যুক্তিবাদী করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে একই সঙ্গে তা আমাদের বিশেষ পটু করে তুলেছে যুক্তির অপপ্রয়োগে। বস্তুত, আধুনিক কালে যুক্তি শুধু মহত্তর নৈতিক গুণে ভূষিত যুক্তিনিষ্ঠ মানুষেরই অস্ত্র নয়, তা নীতিভ্রষ্ট ও যুক্তিভ্রষ্ট অনৈতিক মানুষেরও বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র। তাই দেখা যায় যে মিথ্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েও আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনে আশ্রয় নিয়ে থাকি যুক্তির, আমাদের হীনতা, লোভ ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকে আড়াল করে রাখার জন্য ব্যবহার করি তথাকথিত যুক্তির আভরণ এবং পশুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেও যুক্তিজাল বিস্তার করে আমরা প্রমাণে সচেষ্ট হই যে আমাদের মনুষ্যত্ব এতৎ-সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অসৎ, অনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই যুক্তি আঙ্গিকের নিরিখে ও আনুষ্ঠানিক বিচারে অবশ্যই যুক্তি। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা সত্য যুক্তি নয়, তাকে চিহ্নিত করা যায় মিথ্যা যুক্তি রূপে।

এই মিথ্যা যুক্তি এবং অন্ধ বিশ্বাস—এ দুটিই হল সব কালের ও সব দেশের মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। মিথ্যা যুক্তির অবিরাম ব্যবহারে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে শঠতা ও প্রতারণায় যা শুধু অন্যেরই ক্ষতি করে না, সর্বনাশ করে তার নিজেরও। কারণ যা সত্য নয় তাকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা ও অলীককেই সত্য বলে ভাবতে শেখে। এর ফলে জীবন ও জগতের কঠোর বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয় আত্ম-প্রবঞ্চনার চোরাবালিতে যেখানে নিজের মনুষ্যত্বকে হনন করে সে নিজেই। অন্যদিকে, অন্ধবিশ্বাসের প্রকোপে প্রবল হয়ে ওঠে মানুষের পশুত্ব যার বুদ্ধিহীন, যুক্তিহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে ব্যক্তিজীবনের সুনীতি ও শৃঙ্খলা তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত বনিয়াদ। কাজেই প্রকৃত আধুনিকতার অঙ্গীকার সেই যুক্তির কাছে যা সত্য যুক্তি, নৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন যুক্তি, যুক্তিলব্ধ মহৎ বিশ্বাসের দ্বারা উজ্জীবিত যুক্তি। মনে রাখতে হবে যে সব বিশ্বাসই মন্দ নয়, যেমন শুভ ও সুন্দর নয় সব যুক্তি। মানুষের যুক্তি ও বিশ্বাস যখন মঙ্গল-আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পরস্পরের হাত ধরে আনন্দলোকের যাত্রী, ঠিক তখনই শুভ উদ্বোধন ঘটে মনুষ্যত্বের।

জীবন-অয়ন

অরুণা হালদার

বৈশাখের সূর্য এসে বিশাখা নক্ষত্রে ডাক দেয়;
উজ্জ্বল কিরণধারা সপ্তাশ্ব কে যেন দিল নাম
আরক্তিম রথযাত্রা প্রত্যূষের অভ্যুদয়, আর,—
জপমালাকরধৃতা ধরণীকে শান্ত মাতৃরূপা,
জন্মক্ষণে দুচোখের দৃষ্টিসুধা অভিনন্দনের
ভূমিস্পর্শ লাভ করে কবে যেন জন্ম লভিলাম;
অসহায় ক্রন্দনের সাথে মিলে গেল শঙ্খরব—
নবাঙ্কুর প্রাণকণা পার্থিবসুধার অভিলাষী—
অমৃতসন্ধান তার ক্ষুধা আর পিপাসা নির্ভর!
তিলে-তিলে ক্ষণে-ক্ষণে দিনেরাতে কত আয়োজন
কী মায়া ধরণীভরা স্বপ্ন নাকি নাকি মতিভ্রম।
অশ্রুর অশ্রুত ব্যথা হাসির উজ্জ্বল রেখা আঁকা
ফুলফলপল্লবের সমারোহ উৎসবসঙ্গীত।
প্রাণ থেকে প্রাণস্পর্শ মানুষের গৃহাঙ্গনে এসে
মানুষ থাকে না উপবাসী—ক্ষুধাশান্তি মেলে,
আর তার সাথে মেলে অন্তরের শান্ত উপহার
পার্থিব এ ধরণীর অপার্থিব স্বপ্নের আলোক,
অরূপিত পরিণামে অনন্ত আশ্চর্য
সত্য হয়ে বেজে ওঠে সান্ত গৃহকোণে!
ভুলে যাই কোথা থেকে যাত্রা কবে শুরু হয়েছিল
ক্ষীণ প্রাণধারা কবে হয়েছে দুর্বার স্রোতস্বিনী
শ্যামশষ্পস্বপনিত কোনো খানে, কোনো বাঁকে একান্ত অচেনা
মরুঝঞ্ঝা তৃষাময়—উপলব্যথিত শ্লথগতি;
প্রভাতের সূর্য আছে—উদার আকাশভরা তারা
রাত্রির স্বপনদেখা, প্রত্যহের স্পর্শ নবতর,
মানুষের মুখ দেখা মানুষের হাতে রাখা হাত
সত্যায়িত স্বপ্নলোক অসংশয়িত প্রত্যয়ের!
বৈশাখের বসুধারা চৈত্রমাসে হয়নি নিঃশেষ—
পুনর্যাত্রা ধরিত্রীর, অক্ষমালা হাতে আছে ধরা।
জীবন-অয়ন শেষে সন্ধ্যাকাশে রক্তিম সুন্দর
অস্তাচল সূর্যরশ্মি এঁকেছে আবার কারো নাম,—
অশেষ আলোর যাত্রা প্রজন্ম-প্রজন্ম চিরন্তন,
সায়াহ্নের শাঁখ বাজে কল্যাণকরের বারিধারা
মুক্তদ্বার স্পর্শ করে বলে যায় সব অন্তহীন—

সবকিছু সত্যই নূতন,—আর পুরাতনতায় লীন
যেমন নদীর জল শেষাবধি কালসিন্ধুনীরে—
একান্তে বিলীন হয়—অন্তরীক্ষ ভরা—
একরাশি—আলোর ঝলকে জন্ম নিল আবার প্রত্যূষে
সম্ভাবনাময় দিন চিরন্তন নব প্রাণধারা॥

চতুর্থ ভুবনে সমীহ

শামসুল হক

তিনদিন পরে ফিরে এল সেই সশস্ত্র ভিখিরিনি

স্বর্গে দেখেছে সন্তানখাকি বজ্রখাদিকা করুণাময়ী বাঘিনি
প্রভূত খাদ্য পানীয় নৃত্য সাজিয়ে নিয়েও নতমুখ অধিবাসী
ভিখিরিনি তাই বলল কেবল
ফিরেই যাচ্ছি আমি কবিতার দাসী

পৃথিবীতে এসে ছাখে সে কৃষক চাষবাস ফেলে রেখে
ঈশ্বর নিয়ে জুয়ায় মেতেছে কে তুলবে তাঁকে ছেঁকে
ভিজে মন্ত্র-ও-বারুদ সাজিয়ে শুধু জনকয় নতমুখ অধিবাসী
ভিখিরিনি তাই বলল কেবল
ফিরেই যাচ্ছি আমি কবিতার দাসী

পাতালে দেখল হা হতোস্মি ফুটন্ত জল শুধু ফুটন্ত মাটি
নগ্ন উন্মাদিনী এক শুধু নিজের জন্যে পেতেছে শীতলপাটি
বাসুকি-টাসুকি কিচ্ছুই নেই থাকার মধ্যে ধ্রুব উপাসনাগৃহ

আমার কাছেই ফিরে এসে বলে তুমিই করেছ যা সামান্য সমীহ

দ্রৌহীদিন

শৌনক বর্ধন

আলোকিত স্বর্গ তুচ্ছ করে এল নেমে।
খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙত, কাটত সাবান-পিছল দিন।
গুণবতী আজ কাটছে কেমন বিনিদ্র প্রেম চিতার ধূমে
—অস্ফুটে বাজছে তাম্বুরিন?

আম্রপালী জীবন শুধু জয়ের অভিলাষী
তোমার তো নয় বনস্থলী, দুঃখ আবাস
উত্তরে যার মরণঝাঁপ আঁধারপিয়াসী
তোমায় খাবে যে চেটেপুটে এখনও তার গর্ভে বাস।

ভাঙছে মোহ গুণবতী? এবার রাখো ক্রোধ
স্মৃতি কেন যাচ্ছ ফেলে বাড়ালে যখন পা
জলমগ্ন নগরপথেই যাচ্ছে ডুবে বোধ
যা রে নটী, স্মৃতিসহ রঙ্গমঞ্চে যা···

একদিন হবে

কবিরুল ইসলাম

সুবীরের সঙ্গে দেখা দৈবাৎ স্টেশনে
দেখা নয় এর নাম প্রকৃত প্রস্তাবে
অলেখা সাক্ষাৎকার অমোঘ সন্ধানে
সন্তোষপুরের লম্বা প্ল্যাটফর্ম টানে
তবু পার্ক সার্কাসের দিকে যেতে হয়
ঠিক আছে দেখা হবে দেজে এসো দুটো…
আড্ডা হবে যৎকিঞ্চিৎ পানে ও সেবনে
এসো। কিন্তু আমি আটকে পড়ি : খড়কুটোর মতো
অই দুটো ভেসে যাচ্ছে কিছু কাছে
বস্তুত অকাজে : প্রিয়ব্রত স্বপ্নময়
প্রতিক্ষণ যে-তল্লাট জুড়ে ছিল, আছে—
সে মুখর-কর্মময় দিনগুলি রয়ে যাবে
মর্মের ভিতরে যেনবা সুস্থির ঘুণপোকা
রয়ে গেল।
দিনান্তে পৌঁছুই দেজে
সুবীর সুবীর শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে আসে
দূরে, কাছে, দূর থেকে কাছে

ঠিক আছে দেজে এসো দুটো আড্ডা হবে :
বস্তুত, হল না আজ, একদিন হবে॥

বাঙলা-সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষপর্ব

আজহারউদ্দীন খান

[প্রথম অংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত]

"আনন্দমঠে" সাম্প্রদায়িকতার নগ্নমূর্তি অতি উৎকট-ভাবে প্রকটিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরুরূপে যে সম্মান দেওয়া হয়, সে সম্মান তাঁর প্রাপ্য কিনা আজ সেটা সন্দেহের বিষয়। বিপন চন্দ্র "আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ" গ্রন্থে সরাসরি উল্লেখ করেছেন যে, বঙ্কিমের পরের দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিম মুসলিমদের বিদেশী হিসাবে দেখিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয়ত্ব বা দেশজ সবকিছুই হিন্দুদের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করেছিলেন। …বঙ্কিম ও তাঁর মতো অন্য লেখকরা সাধারণত মুসলিমদের অত্যাচারী আর লম্পট স্বৈরতন্ত্রীর ভূমিকায় ফেলতেন আর হিন্দুদের চরিত্র অঙ্কন করতেন হয় স্বাধীনতা-সহ ইতি-বাচক মূল্যবোধের জন্য সংগ্রামরত বীর, অথবা, মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সংহতি দেখালে, বিশ্বাস-ঘাতক ও দেশদ্রোহী রূপে। এই ধরনের সাহিত্য, যার মধ্যে মুসলিম স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত থাকত, অনিবার্যভাবে শিক্ষিত মুসলিম-দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করত এবং বিকাশমান জাতীয় আন্দোলন থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতা দেখাত। …তাঁকে একেবারে ভুল কারণ-বশতই মহান জাতীয়তাবাদী লেখক আখ্যা দেওয়া হল। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে ইতিহাসের প্রকৃত উপলব্ধির ভিত্তিতে রচিত খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে সংবর্ধনা দেওয়া হল। তাঁর ভূমিকা নিজের যুগে ও নিজের লেখার নিরিখে যত না প্রতি-ক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ছিল, তার চেয়ে বেশি হল তাঁর লেখার সাম্প্রদায়িক অংশগুলিকে উৎকট স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষ গ্রহণ করে তাঁকে অহেতুক গুরুত্ব দেওয়া।' (পৃ ১৪৬-১৪৭)

"আনন্দমঠে" বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে ইংরেজের অধীনতা

থেকে মুক্ত হবার কথা বলেন নি, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথাই বলেছেন। "আনন্দমঠ" একদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, অপরদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মিতালি করার কথা বলেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিদ্বেষ এসেছে। যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় "আনন্দমঠ" রচিত, তার সঙ্গে ইতিহাসের খুব বেশি সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিক সত্যের আশ্রয় থেকে অসত্য ইতিহাস রচনা করেছেন বঙ্কিম, ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতার ধূম্রজাল বিস্তার করে ইংরেজ-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তিনি। এই বিদ্রোহকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা না করে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তিনি বললেন, 'সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'

নবাবের বকলমায় ইংরেজরাই শাসন চালাত। মীরজাফর ছিল তাদের হাতের পুতুল। দেশে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল, এজন্যে দেশের নবাব বা দেশীয় নায়েবরা শুধু একাই দায়ী ছিল না। যে ব্যক্তি তাদের বেশি টাকা দিত তাকেই তারা নবাব-নায়েব ইত্যাদি বড়ো-বড়ো পদ দিত। টাকা দিয়ে যখন পদ ক্রয় করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে ওই ব্যক্তি টাকা উশুল করার জন্য প্রজাদের পীড়ন করেছে। পরদার আড়ালের খবর শিক্ষিত বঙ্কিম নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু চাকরি রক্ষার খাতিরে সেই উপলব্ধিকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে ইংরেজদের বিরাগ-ভাজন হন নি। সাধারণ মানুষ ইংরেজদের এই কৌশল জানত না—তারা নবাব-নায়েবদের দায়ী করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছেন পরদার আড়ালে ইংরেজরা না থেকে প্রকাশ্যে শাসনভার গ্রহণ করুক। শোষণের বিরুদ্ধে জনতার যে সংগ্রাম ছিল, তাকে তিনি মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দিয়েছেন, এবং মুসলমানের শাসনকে খতম করে ইংরেজকে পাকা-পোক্তভাবে শাসকের ভূমিকায় বসাতে চেয়েছেন। সংগ্রামে যখন সন্তানদল জয়ী হল, তারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন না করে ইংরেজের হাতে শাসনভার তুলে দিল, কারণ প্রসঙ্গে মহাপুরুষের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।··· সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহি-র্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই। ···ইংরাজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন-ধর্ম প্রচারের বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা-আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তাহা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।' মহাপুরুষের জবানিতে বঙ্কিমের ইংরেজ রাজত্বের পক্ষে ওকালতিতে রবীন্দ্রনাথ তীব্র আপত্তি করেছেন, 'আনন্দমঠের শেষ কালে বঙ্কিম বলেছেন যে ইংরেজ রাজত্বে আমাদের দরকার ছিল, কেননা তার সাহায্যে আমাদের বহি-র্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হবে। আমি হয়তো বলব বরঞ্চ ইংরেজ আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত করেছে; যেহেতু পরিবেষণের ভার তার উপরে, সেইজন্যই সম্পূর্ণ করে আমাদের পাতে য়ুরোপের জ্ঞান সে দেয় না। অতএব এজন্য আমি কৃতজ্ঞ হতে রাজী নই।' সংগ্রাম শেষ, সাফল্যের

সবটুকু যখন ইংরাজকে দেওয়া হল, সৈনিক ঘরে ফিরে যেতে-যেতে মহাপুরুষকে প্রশ্ন করে: তাহলে এই সংগ্রামের প্রয়োজন কী ছিল। মহাপুরুষ বললেন, 'ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য-শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেননা, রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)

"আনন্দমঠ" উপন্যাস প্রধানত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কাহিনী, সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জুড়িদারহীন নিপুণ প্রয়াস। শান্তি টমাস সাহেবকে বলছে, 'হিন্দু মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।' হিন্দু-মুসলমানে মারামারি মধ্যে তৃতীয় পক্ষের লাভ হয়েছে—বঙ্কিমের হাতে ইংরাজ শাসক বেশ সুখে তামাক খেয়েছে। আর ইংরাজের হাত শক্ত করেছে সেকালের আদর্শে ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যহিন্দুরাই যারা রক্তে ও রঙে হবে ভারতীয় আর নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। বঙ্কিম এই শিক্ষারই অন্যতম ফসল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার মালমসলা "আনন্দমঠে" বেশ ভালোভাবেই আছে। হিন্দুদের মধ্যে এমন একটা ধর্মীয় উন্মাদনা তিনি সৃষ্টি করেছেন যার ফলে গ্রামে-গ্রামে গিয়ে মুসলমানদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, মুসলমান ভগবানবিদ্বেষী বলে সবংশে নিধন করা, মুসলমানদের সর্বস্ব লুঠ করা, 'মার-মার নেড়ে মার' ধ্বনি তুলে খুন করা, মসজিদ ভেঙে রাধামাধবের মন্দির গড়া ইত্যাদি উশকানিমূলক চিত্র তিনি এঁকেছেন। যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তারা আমীর ওমরাহ নয়—সাধারণ মানুষ তারা। অত্যাচারী মুসলমানের শাস্তি হোক, তা বলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করা বঙ্কিমের উচিত কাজ হয় নি। একটা সম্প্রদায়কে লোকসমক্ষে ভীরু জাতিতে পরিণত করে উপহাস করা বঙ্কিমের শোভন রুচির পরিচয় দেয় না—

'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।' গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ-কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, 'মুই হেঁদু'।···

হিন্দুরা বলিতে লাগিল, 'আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেইদিন হউক।' মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, 'আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর কোরানশরিফ বেবাক কি ঝুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলকাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।' ইত্যাদি

সেজন্য অনেকেই বলেন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লাগাবার একমাত্র গ্রন্থ "আনন্দমঠ" আর ড. কাজী আবদুল মান্নান সাহেবের ভাষায়, 'সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের সবচেয়ে নিপুণ প্রয়াস এটি' (তদেব, পৃ ২৭)।

"আনন্দমঠ" উপন্যাসে মুসলমানদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমস্ত অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা তাঁর মতো সাহিত্যসম্রাটের পক্ষে মর্যাদাকর হয় নি। ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ও বঙ্কিমের অশালীন ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'যে ভাষায় তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্তানদের বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন তা আমাদের আদর্শবাদ হতে অনেক দূরবর্তী'। ("আনন্দমঠ: কথাসাহিত্যে বঙ্কিম", পৃ ২৫২, ২য় সং ১৩৭৯)।

"আনন্দমঠ" লেখা নিয়ে নাকি বঙ্কিমের পদোন্নতি বারবার ব্যাহত হয়েছে। ১৮৮১, ফেব্রুয়ারি মাসে

বঙ্কিমকে হাবড়ায় বদলি করা হয়। এখানে কার্যভার গ্রহণের পরই কলেকটার মি. বাকল্যান্ডের সঙ্গে বচসা হয়। কয়েক মাস পর তাঁকে অ্যাসিস্টেনট সেক্রেটারিপদে নিয়োগপত্র দিয়ে বদলি করা হয়। কিছুদিন পর এই পদ বিলুপ্ত করে আনডার সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করা হয়। তখনকার সার্ভিস রুল অনুযায়ী ওই পদে কোনো ভারতীয়কে নিয়োগ করা হত না। পুনরায় ১৮৮৩ সালে তাঁকে হাবড়ায় বদলি করা হয়, এবারও ওপরওয়ালার সঙ্গে তাঁর কলহ হয়। ইতিমধ্যে দেশীয় বিচারকদের হাত থেকে ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। এসব কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল ছিলেন, সেজন্য তিনি নাকি সোজাসুজি ইংরাজের বিরুদ্ধে না গিয়ে মুসলমানকে মাঝে রেখে ইংরেজের বিরুদ্ধে নিজের আক্রোশ ব্যক্ত করেছেন—এরকম কথা বঙ্কিম-সমালোচকরা বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গি ঢাকবার জন্য বলে থাকেন। সেজন্য নিজের চাকরির স্বার্থে বারে-বারে "আনন্দমঠে" পরিবর্তন করেছেন। "বঙ্গদর্শন"-এ যখন "আনন্দমঠ" ধারা-বাহিকভাবে বেরুচ্ছিল তখন তার একরূপ ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্থানে-স্থানে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। প্রথম সংস্করণে কাপ্তেন টমাস সাহেবের নৈতিক চরিত্রের অধোগতির কথা বলেছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ছিল—

> ভবানন্দ বলিল, ভাই ইংরেজ ভাঙ্গিতেছে···ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরাজের ওপর পড়িল। ইংরেজ যুদ্ধের অবকাশ আর পাইল না।

এই অংশটি দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত হল এই-ভাবে—

> ভাই নেড়ে ভাঙ্গিতেছে···ফিরিয়া আসিয়া যবন-দিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের অবকাশ আর পাইল না।

প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে আছে ভবানন্দ বলছে, 'আমি এই ৫০ জন ইংরেজকে নিহত করি।' একজন সন্তান পঞ্চাশজন ইংরেজকে হত্যা করবে, এতে ইংরেজের বীরত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণসমূহে লিখলেন পঞ্চাশের পরিবর্তে 'কয়েকজন ইংরেজকে'। তবু বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বাজাত্যমন্ত্রের দীক্ষাগুরু বলা হয় যাঁর কাছে চাকরিটাই বড়ো কথা ছিল, দেশের মানুষের কোনো মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। সেজন্য পুরস্কার-স্বরূপ চাকরি থেকে, অবসর নেবার পরও তাঁর রাজ-ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে 'রায়বাহাদুর', 'সি. আই. ই.' উপাধিতে শাসকদল ভূষিত করেছে।

"বন্দেমাতরম্" গানটি নিয়েও মুসলমান সমাজে আপত্তি উঠেছিল। একটি মুসলিমবিরোধী কাহিনীর পটভূমিকায় গানটি রচিত হয়েছে আর রাজনীতির মধ্যে ধর্মও সম্প্রদায়বোধ প্রথম থেকে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই হিন্দু নেতৃবৃন্দ কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও অপ্রচ্ছন্নভাবে জীইয়ে রেখেছেন। গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, কালীপূজা, আনন্দমঠের উপর তরবারি রেখে শপথ গ্রহণ ইত্যাদি ধর্মীয় আচারের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে মুসল-মানরা আন্দোলন থেকে সরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে দেশকে মাতৃরূপে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকত না যদি-না ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ নিয়ে হিন্দু নেতারা বাড়াবাড়ি করতেন। স্বদেশী আন্দোলনে শিবাজী ও গণেশপূজার প্রচলন মহারাষ্ট্রে শুরু হয়—হোতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর টিলক। শিবাজী, রাণাপ্রতাপ আঞ্চলিক নেতা ছিলেন—তাঁদের জাতীয় নেতায় পরিণত করা হল, ফল ভালো হয় নি। বিপিন চন্দ্র বলেছেন, 'কী হিসেবে তাঁরা 'জাতীয়' নায়ক, এবং তাঁদের সংগ্রাম কী অর্থে 'জাতীয়' সংগ্রাম? তাঁরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন বলে? কী অর্থে মোগলরা বিদেশী? কারণ তাঁরা মুসলমান

ছিলেন রাণাপ্রতাপ, শিবাজী এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের 'জাতীয়তাবাদের' ঐক্যসূত্র কী ছিল? তাঁরা হিন্দু বা অ-মুসলমান ছিলেন। এভাবে মহাপুরুষ পুরাণগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল।' (আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক ও সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা, পৃ ৭৭, ২য় মু, ১৯৮৯) এই শিবাজী উৎসবের প্রতিবাদে মুসলমানরা ঔরঙ্গজেব উৎসব পালনের তোড়জোড় করে। শিবাজী বা ঔরঙ্গজেব—কেউই জাতীয় নন, তাঁরা এক একটা জাতের নেতা হতে পারেন। এই উন্মাদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও শিবাজীর উপর কবিতা (শিবাজী-উৎসব) লিখে ফেলেন (১৩১১)। এই কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে হুমায়ুন কবির পরবর্তী কালে আকবরের উপর কবিতা লিখেছিলেন। টিলকের সঙ্গে বাঙলার বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ নেতারা হাত মেলালেন। প্রতিমাপূজার মতো শিবাজীপূজা রীতিমতো শুরু হয়ে গেল, আর আন্দোলনও ক্রমশ ধর্মীয় রূপ ধারণ করছে দেখে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা চিঠিতে নিজের ত্রুটির কথা তিনি অকপট স্বীকার করেন, 'উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উদ্যত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।' বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পরাধীন ভারতে কংগ্রেস দিয়েছিল—মুসলমানেরা বর্জনের ডাক দেয়, বিশেষ করে দেবীদুর্গার বন্দনায় আপত্তি তোলে। রবীন্দ্রনাথ "বন্দেমাতরম্" গানে পৌত্তলিকতার কথা স্বীকার করেন, জওহরলাল নেহরুও "আনন্দমঠ" পাঠ করে মুসলমানদের অভিযোগের সারবত্তা স্বীকার করেন। ১৯৩৭ অকটোবর মাসে সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনি লিখেছিলেন, 'মুসলিমদের বিরক্ত করতে পারে।··· এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে বর্তমান হট্টগোল বহুলাংশে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সৃষ্টি। কিন্তু একই সঙ্গে তার মধ্যে কিছু সারবস্তু আছে মনে হয় এবং যাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঝোঁক আছে তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।' কংগ্রেস বন্দেমাতরম্-এর প্রথম দুটি স্তবক নিয়ে বাকি অংশ বর্জন করে, রবীন্দ্রনাথের তাতে সমর্থন ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর পণ্ডিত নেহরু প্রবল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের "জনগণ-মন" গানকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে নির্বাচিত করেন। স্বাধীন বাংলাদেশও রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করেছে।

"দেবী চৌধুরাণী" (১৮৮৪), "সীতারাম" উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মপ্রচারের জন্য হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ তুলে ধরেন। সেজন্য এই দুটি উপন্যাসকেও বারবার তাঁকে পরিমার্জন করতে হয়েছে। শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হলেও শিল্পকুশলতার চেয়ে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য অদলবদল করতে থাকেন। সীতারামের সঙ্গে ফকিরের কথোপকথন বাদ দিয়েছেন প্রধানত এই কারণে। "সীতারামে" বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা খুব বেশি প্রকাশিত হয় নি। এখানে তিনি অনেকটা সংযত, কিন্তু ক্ষতি যা করার তা আগেই করে দিয়েছেন। চাঁদ শাহ ফকির চরিত্রটি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উপরে সর্বজনীন ধর্মের প্রতীক। সীতারামের দ্বারা সর্বজনীন ধর্মরাজ্য গঠন করা সম্ভব হবে বলেই তিনি তার সঙ্গে ছিলেন। সীতারামের নানা দুর্নীতি তাঁকে ব্যথিত করেছে, ফলে তিনি তাকে ত্যাগ করে মক্কাবাসী হয়েছেন।

বঙ্কিম বড্ড দেরিতে বুঝেছিলেন যে একা হিন্দুকে নিয়ে দেশ গঠন করা যায় না। "বঙ্গদর্শন" পৌষ ১২৮০ সংখ্যায় তিনি বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান একণে পৃথক—পরস্পরের সহিত

সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।' জাতীয় ঐক্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্মরণ করলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাঁর রোপিত বিষবৃক্ষ অনেক ডালপালা বিস্তার করেছে। ব্যবধানকে তিনি আগেই বাড়িয়ে রেখে দিয়েছেন, হাতের তীর তখন ছোঁড়া হয়ে গেছে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

।তিন।

বঙ্কিমের সৃষ্টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—তাঁর কাজের ফলভোগ সমগ্র দেশের পক্ষে হিতকর হয় নি। মুসলমানরা যখন শহরে এসে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করছে, তখনই তারা বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানবিদ্বেষ দেখতে পেয়ে প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়েছিল—যদি মুসলিমবিদ্বেষ না থাকত তাহলে মূলস্রোতের সঙ্গে তারা মিশেও যেতে পারত। বিমর্ষ-ভাব কাটিয়ে ওঠে তারা নিজেদের ছোটোবড়ো পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে লেখালিখি শুরু করে। মানুষকে ধর্মের দ্বারা খণ্ডিত করে বিচার করার ফলে বঙ্কিমের আদর্শকে সামনে রেখেই মুসলমানরা তার প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ মুসলিম জাতীয়তাবাদ উগ্রভাবে প্রকাশ করেছে। তারা তাদের উপন্যাসে হিন্দুদের মসীলিপ্ত করে অঙ্কিত করেছে। বঙ্কিমের যে শিল্পগুণ ছিল, সেই গুণের অভাব ছিল তাদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম মুসলমানদের ক্ষোভের কথা সমবেদনার সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন। "সাধনা" পত্রিকার ১৩০১ চৈত্র সংখ্যা তিনি "হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারু-শলাকার মতো আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁষিবার যো নাই। হঠাৎ-বাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হঠাৎ হিন্দুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে, নাটকে, কাগজপত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙলা শিখিতেছেন এবং বাঙলা লিখিতেছেন। সুতরাং এক পক্ষ হইতে ইট এবং অন্যপক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।'

সক্রেটিস একবার বলেছিলেন, 'একজন মানুষের যদি কোনো মহৎ কাজ করার সদিচ্ছা থাকে তাহলে তাকে প্রথমে দেখতে হবে সে তার কাজ করতে গিয়ে অপরের কোনো ক্ষতি করল কিনা, কোনো অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করল কিনা, তার কাজের সুফল সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণকর হবে কিনা।' বঙ্কিমচন্দ্রও "বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন" নিবন্ধে এই কথারই কাছাকাছি কথা বলেছিলেন, 'যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধরা মহা-পাপ।' বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কথা নিজেই রাখেন নি। "রাজসিংহ", "আনন্দমঠ" উপন্যাস পড়লে তাঁর নির্দেশের ওপর তাঁর নিজেরই বিশ্বাস ছিল বলে মনে হয় না। এই সংক্রান্ত বিষয়ে গোপাল হালদার বঙ্কিমের মূল্যায়ন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সেটি দিয়েই আমার কথার নটে গাছটি মুড়িয়ে দিতে চাই—

> বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির একটি ফল সংক্ষেপে এই—শতকরা ৫৪ জন বাঙালি, মুসলমান বাঙালি, তাতে ক্ষুব্ধ। এ ক্ষোভ কতকটা তাঁদের ভ্রান্তি-বশত হতে পারে; কিন্তু এ ক্ষোভ একটা বাস্তব সত্য, বৃহৎ সত্য, স্মরণীয় সত্য। বঙ্কিম তাই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে'র সর্বস্বীকৃত প্রধান নন। তিনি তাঁর সৃষ্টি দ্বারা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রেরণা জুগিয়ে পুষ্ট করেছেন, আবার, তা খণ্ডিত করেছেন—মুসলমান বাঙালিকে প্রতিক্রিয়া-শীলদের দিকে ঠেলে দিয়ে। এইখানে বঙ্কিমের ব্যর্থতা।' ("বঙ্কিম-সমস্যা : বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি", পৃ ৬০-৬১, ১৩৬৩ সং)

বঙ্কিম শতাব্দীর সমুদ্র পার হয়ে এখনও আমাদের মনে ঢেউ তোলেন। তাঁর শিল্পগুণ, রচনারীতি, সরল ভাষারীতি, প্রসাদগুণ এখনও আমাদের অনুকরণ-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও আজ একটি অভ্রভেদী শিখররূপে বাঙলা সাহিত্যে কিছু নিন্দার সঙ্গে বন্দিত হয়ে জীবিত আছেন, এবং দীর্ঘকাল থাকবেনও।

সকাল

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

মেয়েটি ঘুমিয়েছিল নোংরা কাঁথায়। আকাশে ছেঁড়া শাড়ির মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের ওপর, নাকি চাঁদই মাছির মতো ভেসে যাচ্ছে দুর্দিনে সে কে বলতে পারে। ঈশান কোণে মেঘচাপা এক কালসাপ যেন পাক খাচ্ছে—এভাবেই বৈশাখ অতিক্রান্ত হয়। মেয়েটির মুখে-চোখে কোথাও কোনো মায়া আছে কিনা, আবছায়ায় তা ঢাকা পড়ে আছে। বুঝি মাটির মালসায় ঢাকা আছে তরতাজা এক কুটুম পাখি—এইমাত্র ঘুম এসেছিল তার চোখে, গায়-গতরে। ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে চোখ খুলল তার, তলপেট থেকে একটা ককিয়ে-ওঠা সুর যেন নাকের ছিদ্রপথে, —'ঢেমনি মাগী, গায় হাত উঠালি যে খুব।'—মারাত্মক ধারালো সে তেজ, দিশি মুরগির ঠোঁটের মতো তীব্র। এমন সময় শেয়ালদা কোর্টের উলটো দিকের ঠিসারা থেকে পেসাবখানার গন্ধ আসে। লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোক যেন থিতিয়ে-থাকা মদের ডাব্বায় চাটু চালায়। এসবে হামেশাই লোকজনেরা অভ্যস্ত হয়ে আছে। মেয়েটির মা মুখঝাপটা মারে, 'বলি, সন্ধ্যাবেলা ঘুম, ওলো সোগোমারানির ঝি খাবি কী? চোখে আঙুল দিয়ে বলি—সারাটা দিন পড়ে থাকে ঘুমা না। যত পারবি ঘুমা।'—চোখ রগড়ে উঠে ব'সে মেয়েটি দেখে শেলদা স্টেশনের দিকে লোকগমাগম বেড়েছে। এখান থেকে বরাবর আকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু তা খুবই তুচ্ছ, ক্ষীণ, জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। একটা কুত্তা একা-একা কী মনে করে ভাবুক হয়ে বসে আছে, কে জানে। এই পেসাব-গন্ধের সঙ্গে সংসারের পাঁচমেশালি ঘ্রাণ ছুটে আসে হাওয়ায়। গরম কালে এ হাওয়াটি বড়ো নরম, প্রাণে শরম জাগে ঢের। তবু শহরের আলো কেঁপে-কেঁপে ওঠে, বাসে-ট্রামে যেন অবিরত বমির শব্দ—মানুষের কেবল বিবমিষা। মেয়েটা ফের মাকে মুখঝামটা ফিরিয়ে দেয়, তা অকথ্য। সে উঠে যায়, টলটল করে শরীর, ধর্ষিতার মতো দুঃস্বপ্ন দেখেছে যেন এমন নাটক।

নিষ্ঠুরভাবে নিজেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাগে তার শরীরে, যেন বা বিছুটি গাছের লতাবিতান, গায়ে পড়লে জ্বালা করে। লাইটপোস্টের ভেপার ল্যাম্পের নিম্নগামী আলোর নীচে এসে সে দাঁড়ায়। বোঝা যায় পুঁইসাপের মতো কালো-নীল বর্ণসাংঘাতিক তার গায়ের রঙ। একটা বর্ষায় বা বৈশাখে যা কিছুতেই ফিকে হবার নয়।—রাস্তার গড়ানে মিনিবাস তার রক্তাক্ত রঙ নিয়ে যায়, আবার দৌড়ে-দৌড়ে ফিরে আসে। একটা ল্যাংড়া লোকের মতো যেন দেখায়, মেয়েটি দেখে। অসম্ভব শক্ত পিচবাঁধানো মাটি এই শহরে, কোথাও কোনো রস নেই, গ্রীষ্মে গলে গিয়ে কলঙ্কের মতো ঘন হয়ে ওঠে। একটা ছেলে ফ্লাইওভারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকে, 'অ্যাই শালী—।' শীর্ণাতিশীর্ণ তার দেহ। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত। তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। মেয়েটির সামনে অন্য একটি মাঝবয়সী লোক এসে মতলবে হ্যা-হ্যা করে। ফাঁকা উড়ালপুলেও অ্যাকসিডেন্ট বাঁচিয়ে ক্যাঁচ করে থেমে যায় ট্যাকসি। প্রাইভেট কারের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, 'বাস্‌স্টার্ড।' ট্র্যাফিক পুলিশ হাত বাড়িয়ে পয়সা নিতে গেল বলে ঠিকঠাক সময়মত হুইশেল বাজল না। মেয়েটি এসব দেখে কী করবে, কেননা সন্ধ্যা বইছে উত্তরের হাওয়ায়। এন আর এস মেডিকেল কলেজে জন্মাছে, মরছে। মেয়েটি ও লোকটির মধ্যে টাকা নিয়ে বচসা হয়, চাকরিফেরত গৃহস্থ লোকেদের বচসা হয় আলু-পটল-ঝিঙে নিয়ে। নতুন-ওঠা আম রোজই হাফ দরে বিকিয়ে যায়।—আট আনার কলাটি কুড়ি পয়সায় কিনে একটি নাদান খোকা বেমালুম খেয়ে যাচ্ছে।

কনস্টেবলটি জিজ্ঞেস করল তার পেটে রুলের গুঁতো দিয়ে, 'নাম ক্যায়া হ্যায় রে?'

ছোকরাদের মতো খুতনিটি বাড়িয়ে ছেলেটি, খোকাটি বলল, 'ভাগোয়ান—'

'কেয়া দেখতা হো—উধার?'

ছেলেটি প্রথমে উশখুশ করে, তারপর অন্ধকার হয়ে ওঠা কালো ডাস্টবিনটার দিকে আঙুল দেখায়। মেশিন পেশাই আথের খোয়া, ভেজা পচা খড়, ন্যাকড়া ছেঁড়া—কত রকমের নোংরা সেখানে। তার মাঝে পড়ে আছে তাজা রজনীগন্ধার মালা আর লাল গোলাপ। বোধহয় অবাক হওয়ার কিছু নেই—এই শহরের অলিতে গলিতে অনেক সময়ই ব্যবহার-করা ফুল দেখা যায়, ভালোবাসার ফুল! একটা কুকুরী তার প্রায় এক ডজন ল্যানডাপ্যানডা নিয়ে চুঁড়ছে সেই ফুলের চাঁইটিকে। কুত্তাশিশুরা কাঁইকাঁই করছে। —এইসব দেখতে-দেখতে ছেলেটির কলা খাওয়া, এবং রুলের গোঁতা।

এ ভাগোয়ান—কনস্টেবলের গলা ঈষৎ নরম হয়। খাঁকি পোশাকটি তার একেবারেই নিজের মতো। রোজ সন্ধ্যায় সে একবার এসে জিজ্ঞেস করবে, নাম ক্যায়া হ্যায় রে। কিন্তু নাম বিলকুল জানে। খইনি খাবে ডলে-ডলে। তারপর গলা নরম করে বলবে, আরে, মাকে বুলাও—। মা আসবে। তাকে নিয়ে কনস্টেবল চলে যাবে বড়ো পুলের দিকে। ঘরে গিয়ে ঘুম ধরবে না। ঘুম ধরবে না ভাগোয়ানের। ঝুপড়ির ফাঁকের ভেতর থেকে সে একবার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের দিকে তাকাবে। কলা, আম বা বিরিয়ানি খাওয়ার গল্প করবে চোদ্দ বছরের বোন বামির সঙ্গে। আহা বামি—। ফ্রকের ওপর চাপা দেওয়া নেতানো গামছাটি তখন বামির বুক থেকে পড়ে যাবে, দেখা যাবে দুটি ছোটো কাঁসার বাটি আর কিছুটা ময়লা। সে ঘটাং ঘটাং করে শেলদা প্লাটফর্মে ট্রেন ঢোকার শব্দ পাবে বুকের তলা থেকে। তখনও ভাত ফোটে নি হাঁড়িতে। শুধু রাত আর রাত। কবে যে ফুরোবে এই রাত। পাশাপাশি সবাই চিল্লামিল্লি করছে। খাবারদাবারের গল্প করতে-করতে ষোলো বছরের খোকা ভাগোয়ানকে চুপ করে যেতে হবে কিছুক্ষণ, অনেকটা ভাবার ভঙ্গিতে কিংবা অনিচ্ছাতেই ঘুমিয়ে পড়তে হবে তাকে, যেন আরও বহুকাল দায় পড়ে খোকা সেজে থাকতে হবে।

যতদিন রাত ততদিন খোকা থাকা, খোকা থাকার সুবিধে যে ঢের।

হাতের চেটোতে খৈনি ফেলে থাবড়াতে-থাবড়াতে কনস্টেবলটি মৃদু ভোজপুরী গায়—রামা হো-হো-হো-হো। তখন তার বিকশিত দন্তপংক্তি দেখা যায়। রোদে সেঁকা দড়ির মতো পাকানো শরীরটায় বৈদ্যুতিক হলুদ আলো এসে পড়লে তার মুখে চোখে জীবনের প্রতি প্রবল টান দেখা যায়। একটি মুখের ওপর তখন বিচিত্র মুখচ্ছবি।—থু থু করে থুতু ফিকতে-ফিকতে আসে বামির মা, গতরে মাংস ঢের। কিন্তু চোখমুখে অপারগ একটা আঁকাবাঁকা।

'দের কাহে ?'

অনুনয়ে কনস্টেবলের গলাটা মোলায়েম। ঠাণ্ডা। কখনও কুত্তার মিউ, কখনও গর্জায়। শয়তানের সঙ্গে যুঝতে তোমাকেও শয়তান বনতে হবে। আবর্জনার মতো রাস্তায় যারা পড়ে থাকে তাদের পেটে রুলের গুঁতো পড়ে মাঝরাতে। ঘুম ধ্বংস হয়ে যায়। ইতর লোকজনদের কাছে নম্র গলায় উসব লোক কখন কথা বলে!—বামির মা, অপরাজিতা ফুলের মতো তার গায়ের রঙ।

লাইটপোস্টের এই আকাশতলায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এমত খিলখিল সে সারা দিনে বহুবার করে, করতে হয়। বোধশক্তি তার স্থূল দেহটাকে তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। সর্বময় হয়ে জেগে ওঠা তার তিমির হাড়গুলি ঠোকাঠুকি করে বাজে। ক্রেতারা ভাবে হাসি। হায় হাসি! এভাবেই বহু-বহু কালের বাসি মাংসও চমৎকার বিকিয়ে যায়। তার দরে পোশায় না। সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় না, ইস্পাতের মতো বাঁকিয়ে ধরে কোমরের ছিলা। অন্য একটা পুরুষ মানুষ, এদের কোনো নাম থাকে না। পরিচয় থাকে না—এরা শুধু খুকখুক কাশে। এদের কোনো রোগ আছে কিনা বোঝা যায় না। মেয়েটি বলে, 'বুঝেছি। এখন খিদে পায়। চলো, ওই দোকানে কচুরি খাই।'

দুজনে হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো স স শব্দ তুলে চলে যায়। উনুনে আগুন দপ করে। কড়াইয়ের পিঠ ঝলসে যায়। শ্লা এভাবেই কচুরি গরম হয় পৃথিবীতে। লোকজন চুপ করে আছে। কখনও গশ-গশ করেছে। ট্রানজিস্টার বাজছে। দূরে প্রেমিকাটি বাস টার্মিনাসে, সালোয়ার কুর্তা কোমর থেকে ক্রমশ সুড়ঙ্গপথের মতো তার পায়ের কাছে এসে শেষ, এটাকে প্রণাম বলা যাবে না, সে অন্য ক্রিমপালিশ মুখ তুলে শিক্ষিত প্রেমিককে বলল,—কী বলল শোনা গেল না। তবু জানা কথা—রাজি হয়ে যাচ্ছ না কেন? কুমড়ো-আলুর ঘণ্ট দিয়ে, কচুরি খায় মেয়েটি। লোকটি চোখে চোখে খায় যেন রক্তফুল-ভাজা। রাত বাড়ে, নানা কিছু ঘটে এই শহর কলকাতায়, ইটখোলায়। মেয়েটি তাকিয়ে দেখে সেই বুড়িটি গাড়ু হাতে ঠকঠক করে আসছে।

মেয়েটি চোখ মটকে বলে, 'খেপি।'—লোকটি গল্প থামিয়ে দেখে অন্ধকারের মধ্যে বুড়িটা ঢুকে গেল। মেয়েটি জানে খেপির হাতে গাড়ুতে আছে জল। সে সোজা চলে যাবে শেলদা সাউথ প্লাটফর্মের দিকে। বছর কয়েক আগে সেখানে ভরসন্ধ্যায় একটা মার্ডার হয়েছিল। রক্তধোয়া সিমেনট-বাঁধানো সেই চাতালটি খেপি তারপর থেকে রোজ রাতে ঘষে-ঘষে ধোয়। বুড়ি বুঝি খেয়ালে রাখে না, তারপরেও অনেকগুলি মার্ডার ঘটে গেছে এই কলকাতায়। ঘরে বাইরে। ফুটপাথে। এবং তা সংখ্যাতীত। দূরে কোথাও বসে পড়ে বুড়ি ঘষে-ঘষে ধুচ্ছে, সেই শব্দ যেন মেয়েটির কানে আসে ঘশ ঘশ করে। লোকটার কাছ থেকে আরও দশটা টাকা হাতায় মেয়েটি। লোকটা বোকার মতো, মাঝে-মাঝে পুরুষরা এমন হয়। কে কোথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে অন্ধকারে সে কী যন্ত্রণা। বুঝি কশ নামে এই লোকটা ঠোঁটে। দরে পোষায় না মেয়েটির। সে উঠে গিয়ে দাঁড়ায় ফের লাইটপোস্টের নীচে। এমন ভাবে কথা বলে এল, যেন তার গলা শ্লেষ্মায় জড়িয়ে গেছে।

তখন এদিককার ফুটপাথ প্রায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। মিটিমিটি হাসে মেয়েটি। তার কালো মুখে যে রহস্য খেলা করে তাকে জীবিকা থেকে টেনে আনা হয়েছে। তীব্র সুখ বা অসুখ কোনো কিছুই নেই তার। লাইটপোস্টের নীচে যে অপেক্ষাটি তাকেও যেন কখনও কখনও দীর্ঘ মনে হয়—কখন সকাল হবে।—তারপর লোডশেডিং এই কলকাতায়। তখন ফরফর করে হাওয়ার মতো মানুষদের যাতায়াত। কেউ কি ঝগড়া করছে কোথাও। দেখা যায় বামির মাকে, কনস্টেবলটা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একটু ক্ষীণ চাঁদ তখন আকাশের তলায়। মেয়েটি তার চুলে হাত দিয়ে যেন অন্ধকার টের পেল। আরেকটা লোক আসছে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। দেখা যাক যদি রফা হয়।

বুড়িটা কি চাতাল ঘষতে-ঘষতে বিলাপ করছে নাকি। লোকটা এসে বলল, তারপর—খবর কী—অ্যাঁ।

এই সন্ধ্যায় লোকটা তৃতীয় লোক। প্রথম দুটির চেয়ে একটু আলাদা হতে পারে। দেখতেও। স্বভাবেও। সে এসে লোকটির হাত খপাত করে ধরে ফেলল। বলা নেই কওয়া নেই—কেমন বেকুফ কাজ। তবু প্রতিবাদ নেই, মেয়েটা তুখোড়। আখ খেয়ে-খেয়ে সে তার কথাকে কী যে ভীষণ মিষ্টি করেছে। কঁ কঁ করে উঠল লোকটা। বুঝিবা তার কথার ধরন। কেমন আছে খোঁজখবর নিচ্ছে। এদিকে ফুটপাথ, ঝুপড়ি, যেনবা ঝিল্লিমুখর শহর নীরব হচ্ছে। লোকটা বলল, 'মা কালীর দিব্যি—'

মেয়েটা বলল, 'গরম সিঙাড়া হবে?'

বেলেঘাটার দিক থেকে কেমন একটা হাওয়া ভেসে আসছে। বুড়িটা ধুচ্ছে,—ধুচ্ছে,—ধুইয়ে ঘসছে। অনন্তকাল থেকে রক্তপাত আর জলপতনের শব্দ। কে যেন ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদে। কী যেন বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করে। ছোটো বড়ো অসংখ্য পাখি উড়ে বেড়ায় স্মৃতিতে। রাত্রির ঢালে গড়িয়ে-গড়িয়ে স্মৃতি যেন স্বপ্ন হয়ে যায়। —তবু দরে পোষায় না।

বামির তো চোদ্দ বছর বয়স। মাত্র চোদ্দ। জ্বর হলে গা গরম করার পর্যাপ্ত কাঁথা নেই তাদের। রাতে-টাতে হুটহাট এসে কনস্টেবলরা তুলে নিয়ে যায় তার মাকে। তখন দূরে কোনো গাছ বা বৃক্ষের পাতা কাঁপে। তা স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়নসার দেহে যেন ঝোড়ো কোনো গাছের তান বাজে। নানা চিন্তা তার মাথায় জট পাকায়। নতুন-নতুন চোখে তাকায় লোকজন। দাদাটা পড়ে-পড়ে ঘুম মারে। লোভ দেখায় কত লোক। ভালো-ভালো খাবার খেতে ইচ্ছে করে বামির। পায়ে-পায়ে পিঁপড়ে উঠে গিয়ে কামড়ে চাকা-চাকা ফুলিয়ে দেয়। চিঁ চিঁ করে ইদুর ছোটে, কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিকে। হাঁড়ি উল্টে বামি দেখে ভাত নেই একটি দানাও—রাক্ষসীটা খেয়ে গেছে,—মা না আরও কিছু! ছেলেমানুষের মতো কান্না পায় তার, অথচ সে তো বড়ো হয়েছে। ঘুম ধরে না। খারাপ লাগে। সকাল হয় না কিছুতেই।

পেসাব পায়। ভাগোয়ান ঘুমে কাদা। এই পরিবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য তার মা রাতে কখনও একা উঠতে দেয় না। একবার বামি ভাবে দাদাকে ডেকে তুলবে, ডাকতে যাবে এমন সময় একটা কালো বিড়াল এসে বসল পায়ের কাছে। কাঁচা টাকার মতো তার চোখ জ্বলছে। পেটটা গুলিয়ে উঠল ভেতর থেকে। যেন অন্ত্রে-অন্ত্রে জ্বালা ধরল। এখন রাত পাক খাচ্ছে রাতের ভেতর। মায়ের ওপর রাগ লাগে বামির। রোজ তাকে চলে যেতে হয়। সে যাবে, ভালো-ভালো খাবে আর মেয়েকে সে শুধু শাসন করবে। ভালো থাকার জন্য বুকনি দেবে। …তরি নেই, তরকারি নেই। শুধু ভাত গেলো। তলপেটটা টনটন করে বামির। সে উঠে পড়ে। বাইরে এসে দেখে চাঁদের ওপর দিয়ে কাক বয়ে যাচ্ছে। পেসাবের গন্ধ এসে ঢুকে যায় নাকে, নাড়িতে একেবারে অন্ত্রর গহ্বরে।

ভেতর থেকে ওয়াক করে বমি বেরিয়ে আসে। অন্তর-স্থল হু হু করে। সারা শরীর গুলিয়ে-গুলিয়ে ওঠে। কঁকিয়ে-ওঠা এক শব্দ উদগিরণ করে সে। চোখের গভীর থেকে জ্বালা বেরিয়ে-বেরিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। রাস্তাঘাটে কুকুরজন্মের ছাড়পত্র আছে বলে কয়েকটি কুকুরকে এখন দেখা যায়। অবাক হয়ে এই উঠন্ত বয়সের মেয়েটিকে দেখছে তারা। ঝুঁকে থাকার দরুন বামির গলার দিক দিয়ে ফ্রকের ভেতর থেকে ঠেলতে-ঠেলতে বেরিয়ে আসা শারীরিক জ্যোৎস্না দেখা যায়। বড়ো সাধু এই জ্যোৎস্না। ···গঙ্গাঘাটের পলিমাটির মতো নরম। বাইরের থেকে দেখে এর ভেতর বোঝা যায় না, আবার ঢুকতে পারলে ভেতর থেকে বাইরের জগৎকে অজানিত মনে হয়। একটা তীব্র অস্থিরতায় মেয়েটা কেমন শিপশিপ করে কাঁপছে। ভেতর থেকে মুখ বেয়ে তার বেরিয়ে আসছে গরল স্রোত।

মেয়েটি যেন জীবন্ত নয়। কোনো একটি পাথরের স্ট্যাচু—সে তাই সারা রাতই পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে, কখনও একা, কখনও দোকা। তাকে কেনার মতো টাকা আজ বুঝি কারও নেই এই শহরে। এদিকে সকাল আসছে। আকাশ ফেটে-ফেটে, রক্তশিরা দেখা যায় দিগন্তের গায়ে। এখনও রাত আছে তবু ফুটি-ফুটি, এখনও ফুলের অপেক্ষায়। কিছুটা শ্লথ হাওয়া শুধু ছোটাছুটি করে, ভোরের বাষ্পাচ্ছন্নতায় হিম, কেউ-কেউ চেঁচায় কোনো দিকে। রাতচরা পাখির গায়ে যে শেষ নিশাটি নামে তা মেয়েটির দেহে সঞ্চারিত হয়। সে সত্যি-সত্যি কারও প্রতীক্ষায় থাকে।

অল্প লোকজন এখন জেগে, বিচিত্র রাগে তারা যেন কাকে শাসায়। খালপোলের দিক থেকে শুয়োর-দের দাঙ্গা ভেসে আসে। হঠাৎ চারজন লোককে এদিকে আসতে দেখল মেয়েটি। চতুর্দিকে ঘুমিয়ে আছে সবাই, কিন্তু কেউ-কেউ জেগে আছে এই একটা ভরসা। তাদের হাঁটার খশখশ শব্দ হয়। ভয় লাগে না মেয়েটির। তা তো কবেই নষ্ট হয়ে গেছে। লোকগুলি কাছে এলে বোঝা যায় এরা জন্তু জগতের। —না। তবু সামনাসামনি এলে তারা চোখ তুলে দেখল খারাপ মেয়েটাকে। হাওয়ার মতো ত্বরিতে বয়ে যায়। শোনা গেল খনখনে শব্দ। গলার আওয়াজ। হসপিটালে রোগী মরছে—তারা ট্যাকসি পায় নি, সন্ধানে ছোটাছুটি করছে—প্লাজমা দরকার। রক্ত চাই। বাঙ্গুর কিংবা পিজি যেতে হবে। কিন্তু ট্যাকসি মিলছে না এই শহরে। কলকাতায়। তারা পাগলের মতো, কেউ আছে তার কাছে যে মরছে, —শেষবেলায় তার কাছে থাকা উচিত। এমন সময় আবার একটি লোক এসে মেয়েটির হাত ধরল খপ করে। পৃথিবীর সব পুরুষরাই যেন একই ভাবে ধরে। মেয়েটি বলে, 'না।'

লোকটি তীব্র। সে বলে, 'ছুর শালী—'

আরও দুটি লোক আসে। টানাহিঁচড়ে করে, আকাশপটে আগুন জ্বলতে থাকে। মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে, 'উরি বাপ্‌রে'—

আরও দুটি তিনটি সাকরেদ আসে, এ যেন নারায়ণী সেনা,—শেষ হয় না। মেয়েটিকে কোল্‌পাঁজা করে তুলে নিয়ে যেতে চায়। সবাই মিলে খাবে। যেন সবুজ কাঁচা আম, নুন ঢেলে খেলেই হল। জনাকয়েকের ভেতর যে মাতব্বর সে লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে-বাঁধতে আড়ুলে করে শ্লা অশ্লীল শব্দ করে। মেয়েটি আবার চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যাবার ভয় দেখায়। এরা রস খাবে মফতে। পয়সা ঢালবে না। ছটপট করে লোকগুলি। ধস্তাধস্তি চলে। 'মাগীর তো বড়ো টেংরির জোর।'···

চকিতে সামনে এসে দাঁড়ায় একটি ট্যাকসি, 'এই যে দাদা, এখানে ওষুধের দোকানটা কোথায় বলতে পারেন, মেডিকেল শপ?'—

ট্যাকসির ভিউফাইনডার গ্লাস নেমে গেছে অতলে। ভক্-ভক্ করে মদের গন্ধ, 'ওটা?'

মেয়েটি বলে ওঠে, 'এই যে দেখুন না—এরা আমাকে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে'—

সে কথায় কারুর কিছু যায় আসে না। ট্যাকসি উড়ে যায় মাছির মতো। কিন্তু ধস্তাধস্তি-চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেয়ালদা স্টেশনের দিক থেকে কয়েকজন হাঘরে দৌড়ে, আসে, কী হল কী-?-কী হল-?-কী হল-? মেয়েটির পক্ষ নিল বুঝি—ঝড়ের মতো নয়ছয় চলল, কেউ থাকল। তারই মাঝে এক-জনের মাথা ফেটে কিছুটা রক্ত পড়ল মাটিতে। শুধু-শুধু অপচয়! রেল পুলিশ আসতেই দৌড়াদৌড়ি—সব ভোঁ। কোনদিকে ফাঁকা হয়ে গেল।

তখনই বামি বমি করছে। তার মা ফিরে এল। মাতাল কনস্টেবলটা ছেড়ে দিয়ে গেছে আগে। মেয়েকে বমি করতে দেখে বিলক্ষণ কু গাইল তার মন। তরসতরি সে বলে উঠল, 'ছিনাল মাগী, কোথায় ঢলাতে গেছিলি—কে করল এই দশা?'

মেয়েটি আকাশ-পাথর-জল একসঙ্গে, ঘাস-মাটি-পৃথিবী আর জগতের গর্ভস্থিত সম্পদমালা যেন বমির মতো উগরে দিচ্ছে।

'আমি থাকি সাবধান সতর্কে, তুই কিনা সেই ···বল্ না লো কে? কোন্ হারামজাদা?'

হলুদ নীল লাল পাঁচ রকমের জল নেমে আসছে মেয়েটির অন্ত্র থেকে। সে কী বলবে। জীবনের এখানে কোনো পৃথক মূল্য নেই। ভাগোয়ান ভাইটি তার ঘুম থেকে জেগেও অকাতরে পড়ে-পড়ে ঘুম দিচ্ছে। দেবেই তো। সে সে জানে শিবরাত্রির দিন কনস্টেবলটি যখন তার মাকে তুলে নিয়ে তারকেশ্বরে শিব দেখাতে গেল তখন—এভাবেই তো সে কলা খায়। খোকা থাকে। হাতে পয়সা আসে। কিছুতেই সকাল হতে চায় না। শুধু আঁধার বদল হয়।

এরপর চরাচরের বিচিত্র রূপ শুধু একে-একে ধরা পড়ে। সবকিছু একটি পরিপূর্ণ সকালের দিকে যেন ছুটে-ছুটে যায়:

১। মেয়েটি ফিরে যাচ্ছে তার ঘরে। দরে পোষায় নি। মা তাকে মুখ ঝামটা মারবে। হয়ত বা ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমতে গিয়েও কারও জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে। অর্থাৎ সে মানুষ, আশাটি তার এখনও বেঁচে আছে।

২। যেন কোন কিছুই জানে না এইভাবে খোকা ভাগোয়ান ঘুম থেকে উঠে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে আসে। তখন পরিষ্কার সকালের দিকে কলকাতা। সে যেন কলকাতা ধোয়ার কাজ দেখতে যায়। বহুকাল আগে হোসপাইপ ঢেলে পথঘাট ধোয়া হত। গল্পে শুনেছিল। হঠাৎ বুড়িকে দেখতে পায়। সে ধুচ্ছে, খোকা দৌড়ে গিয়ে বলে, জল লাগবে, জল? এনে দেব?

৩। কনস্টেবলকে দিনের আলোয় এখন আর দেখা যায় না, বুঝি সে তার সংসারে।

৪। বামির মা ভেবেই পেল না লোকে তো তুলে নিয়ে যায় তাকে, তো অবাক ভাবে তার চোদ্দ বছরের মেয়ে বামির কী করে পেট হয়ে যায়?

৫। অপস্রিয়মান এই শহর, বামি স্থির, কথা বলবে না সে। যেন চলৎশক্তিরহিত একটি নীরব, নীরবতার প্রতীক।

৬। মারপিটের পর কোথায় ছিল বুড়ি। সে দৌড়ে এসে গত রাত্রের তাজা রক্ত ঘষে-ঘষে তাতে গাড়ুর জল ঢেলে ধুচ্ছে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত যা মাটিতে পড়ে আছে তাকে বুঝি রক্তফুল বলে মনে হয়। সে খেপি। সে ঘষে-ঘষে মার্জনা করছে, ভাবছে ময়লা উঠে যাবে। আরে, ছুর-ছুর, তা কখনও হয়?

ধর্মে, সমাজে, ভাষায় প্রগতিবাদী বিবেকানন্দ

হরপ্রসাদ মিত্র

১৮৬০ থেকে ১৮৮০—এই পর্বের শিক্ষিত বাঙালির প্রগতিমুখী ধর্মভাবনা বললে বোঝায় রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু-নবজাগরণের আন্দোলন। বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) শৈশব, বাল্য, কৈশোর কেটেছে সেই পর্বে। ব্রহ্মদের মধ্যে প্রবীণ এবং তরুণ দলের বিরোধ ঘটছিল তখন। ১১ নভেমবর, ১৮৬৬-তে কেশবচন্দ্রের "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সালে তিনি বিলেত যান এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে "ইনডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন" স্থাপন করেন! ১৮৭০-এ বালক নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশানের ছাত্র হন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে মতান্তরের ফলে ১৮৭৮-এর ১৫ মে কেশবচন্দ্রের "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে দলের সদস্য এবং কেশবচন্দ্রের "নববৃন্দাবন" নাটকে তিনি যোগীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। ১৮৭৯-তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮০-তে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। পরে এফ.এ. পরীক্ষার আগেই চলে যান জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশানে—এখন যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন সে কলেজে তাঁর চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র। ১৮৮৩-তে বি.এ. পাশ করে পরের বছর নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশানের আইন-বিভাগে ভরতি হন। বি.এ. পড়বার সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ W. W. Hastie একদিন ওয়ার্ডস্বার্থের ecstasy প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধির প্রসঙ্গ তোলেন। তার আগেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে জিগেস করেন, তিনি ভগবানের দর্শন পেয়েছেন কিনা। কিন্তু সেখানে ইতিবাচক সদুত্তর পান নি। ১৮৮১-র নভেমবরে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এবং ১৮৮২-তে অর্থাৎ বি.এ. পড়বার সময়েই সে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৮৮৪-র ২৫ ফেবরুয়ারি তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। ১৮৮৬-র ১৬ অগস্ট রামকৃষ্ণদেবের তিরোধান ঘটে। গুরুর মৃত্যুর পরে বরাহনগরে মঠপ্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গায় তাঁর পরিব্রাজক-জীবন কেটেছে। তারপর ১৮৯৩ সালের ৩১ মে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। সেই বছরেই ২৫ জুলাই জাহাজ থেকে ভেংকুবারে নামেন,—অগস্টে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন. এইচ. রাইটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং ১১ থেকে ২৭ সেপটেমবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত শিকাগো বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি সহসা বিশ্ববিখ্যাত হন। অতঃপর চলে তাঁর নানা পর্যটন, ভাষণ, রচনা ও জনসেবার কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩; মৃত্যুদিন ৪ জুলাই ১৯০২। স্বামীজীর ১২৮তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে এই নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল।

বাঙলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-ভাবনার বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত বিচার ও ব্যাখ্যার বাঙলা গদ্য-রীতিতে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি তো বটেই, তা ছাড়া বাঙলা আবেগধর্মী রচনায় অর্থাৎ অল্পসংখ্যক হলেও তাঁর রচিত কবিতা ও গানগুলিতে যে ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর ফুটে ওঠে, তা অনন্যসাধারণ। তাঁর প্রধান গদ্যরচনাবলী বলতে যা বোঝায়, সেগুলি হল যথাক্রমে —"ভাববার কথা" (১৯০৭), "বর্তমান ভারত" (১৯০৫), "পরিব্রাজক" (১৯০৬) এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" (১৯০২)। গ্রন্থপ্রকাশের দিক থেকে এখানে এই পরম্পরা কালানুক্রমিক নয়। "উদ্বোধন" পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে মাঘ, ১৩০৫ সালে—অর্থাৎ ১৮৯৯ সালের জানুয়ারিতে। ১৩০৫—০৬ সাল থেকে প্রথম চার বছরের মধ্যেই এই গদ্যরচনাগুলি প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, "ভাববার কথা"-র প্রথম রচনা "বর্তমান সমস্যা"-ই ছিল "উদ্বোধন" পত্রিকার প্রস্তাবনা। "পরিব্রাজক" বইখানি "উদ্বোধন"-এর প্রথম বছরেই ওই পত্রিকার পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে "বিলাত-যাত্রীর পত্র" নামে ছাপা শুরু হয়। পত্রিকার দ্বিতীয় বছরে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" প্রকাশিত হতে থাকে। "বর্তমান ভারত" পাক্ষিক "উদ্বোধন" পত্রিকাতেই প্রথম দু বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর কিছু বাঙলা চিঠি এবং "বীরবাণী"তে তাঁর স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্র এবং বাঙলা কবিতার ভাবভঙ্গিও ধর্তব্য।

ইসলাম, খ্রীষ্টীয় ও অন্যান্য ধর্মের প্রেম ও সেবার আদর্শ হয়তো রামকৃষ্ণের প্রেরণাতেই তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। বৌদ্ধ মতের তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌গাতা তিনি। "বর্তমান ভারত"-এর 'শূদ্র-জাগরণ' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই বাস্তব প্রগতিচিন্তার পরিচয় আছে।

তাঁর বাঙলা বইগুলিতে এবং পত্রাবলীতে বহু বিচিত্র ভ্রমণসূত্রে পাওয়া তাঁর পরিব্রাজক সত্তার ভূয়োদর্শনের পরিচয় আছে। "স্বামীজীর বাণী ও রচনা" গ্রন্থমালার দশম খণ্ডে ১৮৮৬ র এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৯০২-এর জুলাইয়ে তাঁর মহাসমাধির আগে পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণপঞ্জী ছাপা হয়েছে।

প্রথমবার বিলেত থেকে দেশে ফেরার তিন-চার দিন পরে ১৮৯৭ সালে ফেবরুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাগবাজারে রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম আলাপ হয়। 'শ্রীম' অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরামর্শে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" নামে তখন থেকে ১৯০২-এর জুন মাসের শেষ সপ্তাহ অবধি স্বামীজীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন লিখে রাখেন। বেলুড়-মঠের গুরুভ্রাতারা সে লেখা সংশোধন করে দেন। বাঙলা ১৩১২ থেকে ১৩১৯ সালের মধ্যে সাত বছর ধরে "উদ্বোধন" পত্রিকায় সে লেখা বেরোয় এবং পরে দুই খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে পূর্বোক্ত রচনা বাণী ও রচনার নবম খণ্ডে একত্র পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই রচনার ১০ম অধ্যায়ে রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তোলার ভাব-ভাবনার কথা আছে।

অলৌকিকের দিকে নয়, বুদ্ধিবিচারের দিকেই ছিল তাঁর স্বভাবের টান। "স্বামী-শিষ্য-সংবাদে" ১৮৯৮-এর বিবরণেই দেখা যায় যে, শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে তিনি নিজের পরিব্রাজক-জীবনের মধ্যে একবার হিমালয়ের কোনো এক গ্রামে একজনের ওপর 'দেবতার ভর' হবার এবং উপদেবতাবিষ্ট সেই লোকটিকে আগুনে পোড়ানো ও কুঠার ছোঁয়ানোর ঘটনা দেখেন, তাতে লোকটির কোনো কষ্টের চিহ্ন ছিল না এবং তার মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশই পোড়ে নি বা আহত হয় নি। গাঁয়ের মোড়ল তখন তাঁকে করজোড়ে লোকটির কাছে যেতে অনুরোধ করে। তিনি নিজে সেই কুঠার ছোঁবামাত্র তাঁর হাত পুড়ে যায়। জ্বালায় অস্থির হয়েও তিনি লোকটির মাথায় হাত রেখে কিছুক্ষণ জপ করতেই সে সুস্থ হয়ে যায়। আর-একবার আমেরিকা যাবার আগে মাদ্রাজের অ্যাকাউনট্যানট-জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছিলেন যখন, সে সময়ে একরাত্রে জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়েছে, এই স্বপ্ন দেখে শহরের কিছু দূরে এক পিশাচসিদ্ধ লোকের কাছে যান আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং আর-এক সঙ্গীকে নিয়ে। তাঁর নিজের কথায়, সে—'প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বল্‌লে, আর বল্‌লে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন। মায়ের মঙ্গলসমাচারও বল্‌লে। ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহু দূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে।' এই প্রসঙ্গে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন—'ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল।' পরমুহূর্তেই শিষ্যকে বলেন—'এইসব ছাইভস্ম কথা-গুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবি নি। কেবল সদসৎ বিচার করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ন করবি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।' এরকম অলৌকিক ঘটনা তাঁর অভিজ্ঞতায় আরো কিছু-কিছু ঘটেছে। কিন্তু সেসব ব্যাপার 'মায়া', 'ভেল্‌কি', বলে তিনি বুদ্ধিবিচারের ক্ষেত্রে সজাগ থেকে শিষ্যকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার উপলব্ধিতে আত্মস্থ থাকবার উপদেশ দেন।

বিবেকানন্দের এই লৌকিক-অলৌকিক মিশ্র অভিজ্ঞতা,—তাঁর অধ্যয়ন, কৌতূহল, যোগ, সমাধি, —তাঁর সর্বজীবে প্রেম,—তীক্ষ্ণ বিচার,—গভীর অভিনিবেশ,—তাঁর বিশ্বভ্রমণের ব্যাপ্তি ইত্যাদিই ছিল তাঁর বাঙলা রচনাবলীর স্থায়ী প্রেরণা। আধুনিক প্রায় দু-শ বছরের বাঙলা সাহিত্যে ঠিক এরকম দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। রামমোহন আর বিবেকানন্দ—এই দুই লেখকের সম্বন্ধে কতকটা স্বভাবগত নৈকট্য অবশ্যই ভাবা চলে। তবে রামমোহনকে যে-অর্থে ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছিল, বিবেকানন্দকে সে-অর্থে নয়। তাঁর আগেই বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ প্রভৃতির কলমে বাঙলাচর্চা সারল্য আর সৌষম্যের দিকে এগিয়েছে। আবার, শিবজ্ঞানে জীবসেবার বুদ্ধি ও বোধিই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বিশিষ্টতম প্রেরণা। তাঁর গদ্যরীতির লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর রচনা যেন নিজস্ব সহজ মৌলিক উচ্চারণ,—তা অবশ্যই অকৃত্রিম এবং প্রবল প্রত্যয়গুণে তা চিত্তাকর্ষক। রামমোহনের গদ্যের চাল ছিল অন্য জাতের। তাতে মসৃণতার অভাব ছিল।

উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে রামমোহন রায় যেমন এদেশে অন্ধ আচারের বন্ধন থেকে জনমানসের ব্যাপক জাগৃতির আন্দোলন ঘটিয়ে গেছেন, পরের পর্বে বিবেকানন্দও তেমনি প্রবল আর-এক আন্দোলনের নেতার ভূমিকাতেই তাঁর ইংরেজি আর বাঙলা রচনা, ভাষণ রেখে গেছেন। তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে এই বিদ্রোহী ও সংস্কারক সত্তা থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা সম্ভব নয়। "বাংলার নবযুগ" বইটিতে মোহিতলাল মজুমদার 'রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন' সম্পর্কিত আলোচনায় যা লেখেন তার দুটি মাত্র উক্তি এইসূত্রে

উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। তাঁর কথায়—'প্রায় সমসাময়িক ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে মানুষমাত্রেরই যে স্বাধিকারবোধ—রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার হইতে মুক্তি-লাভের যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছিল,—রামমোহনের এই চেষ্টার মূলেও তেমনই এক ভিন্নতর বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিবার সেই একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইহাই সে যুগের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা।' মোহিতলাল লেখেন যে, রামমোহনের নতুন মুক্তিতন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তিবাদ সেকালের পণ্ডিতসমাজকেই আঘাত করেছিল, জাতির ব্যাপক সমষ্টিচৈতন্যে তার সাড়া জাগে নি। ইউরোপের সংস্পর্শে ইউরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম প্রভৃতির চর্চা এবং স্বদেশের লুপ্ত ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কার-এর উদ্যম,—রামমোহনের মধ্যে এই দুই অভিমুখিতাই দেখা দেয়। মোহিতলাল মনে করেন—বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ রামমোহনের তুলনায় বহুগুণে গভীর ও ব্যাপক, কারণ, বিদ্যাসাগর সেবা ও প্রেমের শক্তিতে সাক্ষাৎ জীবনের ক্ষেত্রেই তাঁর বিদ্রোহকে 'সাকার' করে তুলেছিলেন। এসব মন্তব্যের চুলচেরা বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের সন্নিহিত পূর্বাবস্থা এক নজরে দেখে নেবার জন্যেই এসব কথার অবতারণা। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাপ্রসঙ্গে "বিনয় সরকারের বৈঠক" (দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৪৫) বইয়ে অধ্যাপক সরকারের এই মন্তব্যটিও একই কারণে স্মরণীয়—'বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেব-দেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জল-মাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, দেশ-দেবী, বাংলা-দেশ। নয়া আখ্যাতিকতার ফোয়ারা ছুটছে এই মন্তর থেকে।' তিনি আরো লেখেন—'বন্দেমাতরম্ অহিন্দু আখ্যাতিকতার মন্তর, ভক্তিমার্গী নাস্তিকতার সুরা। এই মন্ত্রে কৎ-পন্থী বঙ্কিম-দর্শনের সমাজসেবা বা মানব-পূজা সরস মূর্তি পেয়েছে।'

স্বামীজীর সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় এই ধরনের মতামতের প্রাসঙ্গিকতা কতদূর, সে-বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় লাভের জন্যেই এইরকম আর-কিছু কথার অন্তত উল্লেখটুকুও অনিবার্য। এই কারণেই "স্বদেশমন্ত্র" থেকে তাঁর গদ্যভাষাভঙ্গির সর্বাধিক আবেগস্পন্দনের সুপরিচিত নমুনা,—তাঁর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'সখার প্রতি' ইত্যাদি কবিতা এবং আরো নানা রচনা বারবার স্মরণীয়। তাঁর বাঙলা চিঠিগুলিও এইসূত্রেই একটু দেখা যেতে পারে। ১৮৯৩ সালের ২৬ মে বোম্বাই থেকে ইন্দুমতী মিত্রকে লেখা সাধুরীতির বাঙলা গদ্যে তাঁর একটি চিঠির ভাষার নমুনা দেখা যাক। সে-পর্বে তিনি 'সচ্চিদানন্দ' নাম ব্যবহার করতেন। 'পত্রাবলী'র এই ৬৬-নম্বর চিঠি আছে তাঁর 'বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে। হরিপদ মিত্রের স্ত্রী ইন্দুমতীকে তিনি এই চিঠিতে লেখেন—'মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাক। সর্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ ৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে যে প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র।' এই চিঠিরই আরো কয়েক ছত্র পরে তিনি লেখেন—'তুমি ইন্দুমতী 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণমহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হারর দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা ইন্দুমতী মিত্র ইত্যাদি।'

আরো বছর তিনেক আগে, বাগবাজার থেকে স্বামী সারদানন্দকে ৬ জুলাই ১৮৯০ তারিখে লেখা

"পত্রাবলী"র ৪৯ নম্বর চিঠির ভাষার পার্থক্য দেখার জন্যেই সেখান থেকে এই নমুনাটুকু দেওয়া হল—'আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটিই করা নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ যাও। আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে, তাকে 'ওঠ, ছুঁড়ী, তোর বে' বলে জাগিয়ে দিলেই হল। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই মুষ্টিমেয় লোকের অধিক কেহ জ্ঞান লাভ করে না, এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত, তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরানো চাল, জানই তো। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের নামে যে ঠকবাজী চলিতেছে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্যবান্ হও। রাখাল লিখিতেছে যে দক্ষ (অর্থাৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ) তাহার সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে এবং সে সোনা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান তাহাকে আশীর্বাদ করুন এবং তোমরাও বল, শান্তিঃ। শান্তিঃ।' যুক্তিবাদী বিবেকানন্দের এই ব্যঙ্গোক্তি সরল ও সুস্পষ্ট।

তাঁর অজস্র ইংরেজি চিঠির বঙ্গানুবাদ আছে "পত্রাবলী"-তে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেগুলির সঙ্গে বাঙলা চিঠির সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব বাঙলা ভঙ্গির প্রসঙ্গে সেসব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'আরে দাদা', 'পাদ্রী-ফাজী', 'গপ্পি' (গালগপ্প অর্থে), 'পোড়া হিংসেটা' প্রভৃতি শব্দ,—ক্ষণে-ক্ষণে সংস্কৃত থেকে সদ্যুক্তি, কাব্যাংশ বা শাস্ত্র-বাক্যাংশ,—ভূরি পরিমাণে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর এইসব বাঙলা চিঠিতে পাওয়া যায়। যখন দেশে ছিলেন, তখনো যেমন, বিদেশ থেকে লেখা চিঠিতেও তেমনি। তবে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কের প্রভেদ অনুসারে ভাষার চাল বা ভঙ্গিরও পার্থক্য দেখা যায়, যেমন ১৮৮৯-এর ৪ জুলাই বাগবাজার থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা "পত্রাবলী"র ১০ নম্বর চিঠিতে তাঁর তখনকার পারিবারিক পরিস্থিতির পরিচায়ক হিসেবে যার আংশিক উদ্‌ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি লেখেন—'কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব—এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্যে বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়, আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ একপ্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"' আবার, ১৮৯৪-এর ১৯ মার্চ শিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা "পত্রাবলী"র ৮৪ নম্বর চিঠিতে —'প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো-সুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো, তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বলল।···দাদা আমি দেখেশুনে অবাক। বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট হয়েছে এদেশে। তবে আমার মতো তোদের হল না, তা আমার কি দোষ?···সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাজীর কি

কর্ম? আরে এরা বিদ্যানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপূজা করি না'—এসব আর চলে না—পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, এরা চায় ফিলসফি Learning ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।'

তখনকার কলকাতার চলতি মৌখিক গদ্য এইভাবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পোশাকি আদল পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে অনাড়ম্বর আটপৌরে চালে পৌঁছেচে। যেমন, ওই চিঠিতেই তিনি লেখেন—'এদেশের বরফ যেমন সাদা, তেমনি হাজার-হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা। প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" অপর পক্ষে ২০ মে ১৮৯৪ তারিখে স্বামী সারদানন্দকে লেখা "পত্রাবলীর" ৯৩ নম্বর চিঠির ভাষা অবিমিশ্র সাধু-রীতির এবং তার ভঙ্গিও অকৃত্রিম। ভাষা তো আকাশ থেকে পড়ে না, তার মূল নিহিত থাকে লেখকের ভাবে, ভাবনায়, বিশ্বাসে, সংকল্পে। এইসব চিঠিতে তাঁর সংগঠনশক্তি, জীবপ্রেম, স্থির-বিশ্বাস ইত্যাদির পরিচয় সুস্পষ্ট।

সংসারাশ্রমে রামকৃষ্ণানন্দের নাম ছিল শশিভূষণ চক্রবর্তী। স্বামীজীর সেকালের অন্যান্য ভক্তের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ), তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ), হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরীয়ানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ), হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) ইত্যাদি। ১৮৯৫-এ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এবং সেই বছরেই মঠের সকলের উদ্দেশে গুরুভ্রাতাদের কাজের প্রশংসা ক'রে পর-পর "পত্রাবলী"র ২৩৯ ও ২৪০ সংখ্যক পত্রে রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতির কর্মনিষ্ঠার উল্লেখ করেন তিনি। সেই ২৩৯ নম্বর চিঠিতেই হরমোহন একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করছিলেন বলে উল্লেখ আছে এবং কালী, শরৎ, হরি, মাষ্টার, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে সে কাজে আত্মনিয়োগ করাবার আগ্রহ দেখা যায়। ২৩৯ নম্বর চিঠিতে তিনি লেখেন—দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে তো বড়-ছোট দেখিতে পাই না, কাজের বেলায় মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তার দৃঢ় নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তি-স্বরূপ। কালী ও যোগেন টাউন-হল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল—কত গুরুতর কার্য। নিরঞ্জন সিলোন (অর্থাৎ সিংহল) প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে। সারদা কত দেশ পর্যটন করিয়া বড়-বড় কার্যের বীজ বপন করিয়াছে। হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি, তখনই নূতন বল পাই। তুলসী, গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক মহাশক্তি আছে। তিনি (অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব) যে জহুরী ছিলেন, তাতে এখনও যদি সন্দেহ হয়, তাহলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাৎ কি?' ২৪০ নম্বর চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা হয়—'সারদা (অর্থাৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) কি বাঙলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়।' কালী ও যোগেন সম্বন্ধে এখানে যে উল্লেখ দেখা গেল, সে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপটেম্বর কলকাতা-টাউনহলে নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্বামীজীর অভিনন্দন-সভার ব্যাপার। আবার, নিরঞ্জনানন্দ সিংহলে ও দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করে ১৮৯৫-এর প্রথম দিকে আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন, তারই উল্লেখ পাওয়া গেল। ১৮৯৪ থেকেই স্বামীজীর মনে মঠের এক আদর্শ মুখপত্র প্রকাশের চিন্তা ছিল। অবশেষে ১৮৯৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি (অর্থাৎ ১লা মাঘ ১৩০৫) স্বামী সারদানন্দের সম্পাদনায় এবং অধ্যক্ষতায় পাক্ষিক "উদ্বোধন" প্রথম প্রকাশিত হয়। সেকথা আগেই দেখা গেছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫-এর আর-একটি চিঠিতে ("পত্রাবলী"-১৫৬) তিনি লেখেন যে, বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলা চাই। পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় যাতে ফলপ্রসূ হয়, তাতে সে কথাও ছিল। এইভাবে নানা গঠনমূলক কাজেই হৃদয়ের বিকাশ হবে, এই কথা জানিয়ে, মা ঠাকুরানীর (সারদাদেবী) জন্যে একটু জমি কেনবার ব্যবস্থা করতে বলেন। একজন হৃদয়বান মহাতেজস্বী লোকের কথা সে-সব—'নাই বা হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম রাম। আবার 'নেই-নেই' বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? ও কোন্ দিশী বিনয়—'আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই' —ও কোন্ দিশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও রকম 'দীনাহীনা' ভাবকে দূর করে দিতে হবে! আমি জানি নি তো কোন্ শালা জানে?' পূর্ব প্রসঙ্গে তাঁর আরো কথা—"রাখাল ভায়া,·· আমার টাকাকড়ি সব মজুত, খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখেশুনে কেনো। জমির জন্য ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর-দ্বার এক্ষণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে। যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক দিন চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শে করিবে। আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ-নরকের ভেদ। এদেশের লোক এককাট্টা হয়ে কাজ করে, আর আমাদের সকল কাজ বৈরিগ্যি, হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।' দেখা যায়, এই চিঠিতেই তিনি গড়তে চেয়েছেন সমিতি, সংঘ—'যদি একটা মঠ বানাতে পারো, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম। মান্দ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কাজ করবে। তাদের কাজ করবার অনেক শক্তি আছে।' প্রচার ও গঠনের ব্যাপারে ওই চিঠিতেই তাঁর ছিল এই পরামর্শ—'চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে বা শহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি? হরিসভা প্রভৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে 'স্বাহা' করতে হবে। কি বলবো তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মতো পেতুম। ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন।' তাঁর "পত্রাবলী" বড়ো বিচিত্র আনন্দের পাঠ। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি চিঠি লিখেছেন, যেমন ১৮৯৭-এর ১৯ মার্চ দার্জিলিং থেকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা ৩১৯ নম্বর চিঠি।

১৩০৪ সালে রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময়ে "ভাববার কথা"র প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রকাশিত হয় 'হিন্দুধর্ম কি?' নামে এক পৃথক পুস্তিকায়। এটি বেরিয়েছিল "উদ্বোধন"-এর চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায়। সাধুরীতির গদ্যে 'বেদদ্রষ্টৃত্ব', 'জ্ঞানবেতৃত্ব', 'প্রপতিত নদীর জলরাশি', 'শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময়' ইত্যাদি শব্দসম্ভার এটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' হল অধ্যাপক ম্যাক্স্মুলার রচিত 'The Life and Sayings of Ramakrishna' বইটির সমালোচনা। "উদ্বোধন"-এর প্রথম বছরেই পঞ্চম সংখ্যায় 'ম্যাক্স্মুলার-কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামে এটি ছাপা হয়। ম্যাক্স্মুলার ১৮৯৬ সালের অগস্ট সংখ্যার *Nineteenth Century* পত্রিকায় 'A Real Mahatman' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং ১৮৯৮-এর নভেমবরে 'Ramakrishna : His Life and Sayings' নামে তাঁর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ম্যাক্স্মুলারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথাগুলি সুপরিচিত। ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির বিপুল ব্যয়ে এবং ম্যাক্স্মুলারের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে ঋগ্বেদসংহিতা প্রকাশিত হয়। সেকথা উল্লেখ করে স্বামীজী লেখেন—'অধ্যাপক ম্যাক্স্মুলারের জীবনে এই ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটি প্রধান কার্য। এতদ্‌ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বসবাস—জীবন-যাপন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ—বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত, যজ্ঞধূম-পূর্ণাকাশ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বহুল, ঘরে ঘরে গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের নিয়মাবলী পরিচালিত, তাহা নহে। বিজাতি-বিধর্মী-পদদলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মাণ, আধুনিক ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদাজাগরুক হইয়া সংবাদ রাখেন।' ম্যাক্স্মুলার তাঁর এই প্রবন্ধ লেখবার আগে ১৮৭৯ সালে *Theistic Quarterly Review* পত্রিকার অকটোবর সংখ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজি প্রবন্ধ 'Paramhamsa Ramakrishna' বেরোয় এবং পরে পৃথক পুস্তিকা রূপে "উদ্বোধন" থেকে সেটি ছাপা হয়। ১৮৯৬-এর *Asiatic Quarterly Review* পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ C. H. Tawney লেখেন 'A Modern Hindu Saint' নামে প্রবন্ধ। স্বামীজী তাঁর এই বাঙলা নিবন্ধে ম্যাক্স্মুলারের বইটি সম্বন্ধে লেখেন—'এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মা পুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, সন্ন্যাসী, যোগ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর অবতারণা করা হইয়াছে।' তারপর লেখা হয়—'বর্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস—তৎসংকলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি উদূখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্স্মুলার ভুলেন নাই এবং ব্রাহ্ম-ধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের দোষোদ্‌ঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরমুখে দুই-চারিটি কঠোর-মধুর কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপূর্ণ বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয় সন্দেহ নাই।' এই বইয়ের আগে লেখা ম্যাক্স্মুলারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে আলোচ্য বইটির তুলনাসূত্রে স্বামীজীর মন্তব্য ছিল এই—" 'প্রকৃত মহাত্মা' নামক প্রবন্ধে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অতি যত্নে আবরিত। একদিকে মিশনারী, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল—এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে '"

"ভাববার কথা"-তে নোট নটি বিষয় আছে এবং বর্তমান সমস্যা' যে উদ্বোধনের প্রস্তাবনা রূপে ছাপা হয়, সে-কথা আগেই দেখা গেছে। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের মহিমার কথা আছে এবং দেশ-কালের বাধা তুচ্ছ ক'রে ভারতীয় ভাবৈশ্বর্য যে অন্য জাতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তাও বলা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের বলবীর্যের ও শিল্পকলার সমৃদ্ধির এবং সারা ইউরোপে তার প্রভাবের কথা আছে। তারপর তিনি লেখেন—'অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহসম্মিলনে রোমক ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূচিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহা-জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ওই প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ওই দুই মহা-শক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।' এর পরেই লেখা হয়—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ভারতের বায়ু শান্তি-প্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান, একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা, একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ', একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত···ইত্যাদি।

এই 'বর্তমান সমস্যা' লেখাটি উনিশ শতকের শেষ প্রান্তের প্রতি ইঙ্গিত। একদিকে প্রাচীন-গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতি, —রোমক, ইরানী, আরবীয়দের অভ্যুদয়,— অন্যদিকে, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি,—এই অতীতের ভাবনা-সূত্রেই লেখা হয়—'ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।' এই কথার পরেই দেখা দেয় তাঁর এই প্রশ্ন—'প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?' অতীতের যথাযথ পুনরাবৃত্তি যে সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতে ঠিক কী যে ঘটবে তাও অনির্ধারিত, এই মন্তব্যের পরে তিনি ভারতের পক্ষে প্রবল রজোগুণের উদ্দীপন ও আত্মকর্তৃত্বে জাতির সম্মুখগতি কামনা করেন। আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বরণীয় বটে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষ প্রান্তের এই ভারতপ্রেমী বিশ্ব-পথিক অনুভব করেছিলেন যে—'যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না—যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন-ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই।' মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তখন লোকান্তরিত বটে, কিন্তু তাঁর বন্ধু ও গুরু-ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র,—এবং রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, —অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আরো অনেকে ছিলেন। তবে, দেশের বিপুল জনসংখ্যার হিসেবে তাঁরা তো মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই তিনি লেখেন—'সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ ভারতে কয়জন?' তারপর দেখা যায় তাঁর এই মন্তব্য —'যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি-কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে।'

সত্ত্বগুণে পৌঁছোতে হলে রজোগুণের মধ্য দিয়েই যেতে হবে,—ভোগ শেষ না হলে যোগ সম্ভব নয়,—বিরাগ না ঘটলে ত্যাগ দেখা দেবে কেন? এই ছিল তাঁর যুক্তি। দেশ তখন তমোগুণসমুদ্রে ডুবছে। উনিশ শতকের অজস্র স্বনামধন্য কীর্তিমানদের কথা মনে রেখেও তাঁকে একথা বলতে হয়েছে যে, বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ নিঃস্বার্থভাবে সত্যকে ধারণ করাই তখন যথার্থ উন্নতির পথ,—'এ জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে অসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে-সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?'

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে মূলত এদিক থেকে বিবেকানন্দের চিন্তার নৈকট্যই চোখে পড়ে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন এবং সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে ভূদেব ঠিক কোন্ কোন্ দিক থেকে এই পাশ্চাত্য প্রেরণা কত বেশি মেনে-ছিলেন বা মানতে চান নি, সে-চিন্তা বিশদতর আলোচনা দাবি করে বটে, কিন্তু উপস্থিত নিবন্ধে তা জরুরি নয়। বরং ১৯০০ সালের ২০ ফেবরুয়ারি আমেরিকা থেকে "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা বিবেকানন্দের যে চিঠির উদ্ধৃতি "ভাববার কথা"-তে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে ছাপা হয়েছে, ভাষা-ব্যবহারের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব সেই চিন্তাসূত্র-গুলি অধিক প্রাসঙ্গিক। সেই পুরো প্রবন্ধটিই একজন সচেতন ভাষাশিল্পীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা এবং নির্দেশ। তিনি জানান যে, আমাদের দেশে

প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় বিদ্যার প্রচার ছিল বলে বিদ্বান ও জনসাধারণের মধ্যে অপার ব্যবধান দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণপরমহংস লোকসাধারণের ভাষাতেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের কথায়—'পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত-মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?' এই 'স্বাভাবিক ভাষা' বলতে তিনি বুঝতেন সেই ভাষা যাতে মনের সব ভাব সুবোধ্য ভাবে প্রকাশিত হয়,—যাতে দর্শন-বিজ্ঞানের চিন্তা আর বিচার সম্ভব। বলা বাহুল্য, পরিভাষা এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তিনি 'পরিভাষা'-র উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সহজ চলিত রীতিই আদর্শ হোক, তাঁর এই আসল বক্তব্যের মধ্যেই যোগ্য সহজ পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা একভাবে মেনে নেওয়া হয়, যেমন তিনি লেখেন—'ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।' তিনি বুঝেছিলেন সে-আমলে রাজধানী কলকাতার ভাষা-ই যেহেতু বাঙলার সব অঞ্চলের বোধ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল, অতএব সেই ভাষাই গ্রহণযোগ্য। সংস্কৃতভাষা ব্যবহারের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ছিল—'ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শংকরের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।' তিনি চেয়েছিলেন ভাষার ক্ষেত্রে বৃথা অলংকরণ নয়, চলিত রীতিতে যথার্থ প্রাণের বল-সঞ্চার। তবে সাধু-রীতি পুরোপুরি ত্যাগ করেন নি তিনি—'ভাববার কথা'র 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটিতেও তার পরিচয় আছে। আবার 'ভাববার কথা' নামে অনুচ্ছেদ-পর্যায়ে দুই রীতিই মেনেছেন তিনি। বইটির শেষ রচনা 'শিবের ভূত' তাঁর দেহত্যাগের পরে পাওয়া তাঁর স্বহস্তে লেখা অসমাপ্ত একটি গল্প।

তাঁর "পত্রাবলী"তে এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদে' যেমন ভ্রমণ-সাহিত্যের আবেদন ছড়িয়ে আছে, তেমনি ঘটেছে তাঁর "পরিব্রাজক"-এ এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"-তেও। ১৩১৮ সালের তৃতীয় সংস্করণে "পরিব্রাজক" সম্বন্ধে প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত এই মন্তব্য জন্মশতবর্ষ-সংস্করণের ষষ্ঠ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—'পরিব্রাজকের কাগজপত্র অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার অষ্ট্রিয়া হইতে তুর্কি হইয়া ইজিপ্ট প্রত্যাগমনাবধি ভ্রমণকাহিনী কতক সবিস্তারে এবং কতক 'ডায়েরি'র আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সবিস্তার বর্ণনাংশটি বর্তমান সংস্করণে পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত এবং 'ডায়েরি'র নোটগুলি পরিশিষ্টের মধ্যে মুদ্রিত করা হইল।'...১৮৯৯-এর ২০ জুন কলকাতা থেকে "গোলকোণ্ডা" জাহাজে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-ভ্রমণে যাত্রা করেন এবং "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে পত্রাকারে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠিয়ে দেন। "উদ্বোধন"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ-ভ্রমণের কাহিনী "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" (১৮৮১) এবং "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি" (১৮৯১, ২য় খণ্ড ১৮৯৩) নামে তার অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। এঁদের দুজনের রচনারীতির তুলনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এঁরা উভয়ে পৃথক-পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক-পৃথক। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" তাঁর "পরিব্রাজক"-এরই সমকালীন রচনা। "উদ্বোধন"-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয়

বর্ষে এ-লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। "পরিব্রাজক"-এর 'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ'-এর প্রথম অনুচ্ছেদ, আর তাঁর "বর্তমান ভারত"— যেটিকে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন ভারতেতিহাসের পূর্বাপর সম্বন্ধ নিরীক্ষার এক 'অমূল্য রত্ন' এবং 'অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ',—সে-বইয়ের শেষ নিবন্ধ "স্বদেশ-মন্ত্র" আবেগের স্পন্দনগুণে এরা পরস্পর তুলনীয়। এই দুটি থেকে মাত্র কয়েক ছত্র মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রথমটিতে তিনি লেখেন—'হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর হর হর" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি-নির্ঝরের "হর হর হর" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে, ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ?'

এরই পরবর্তী অংশে গঙ্গাজলের মহিমার কথা আছে, বৃহৎ বদনাকার কমণ্ডলুর মধ্যে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে তাঁর অসুবিধার কথাপ্রসঙ্গে কিছু পরিহাস আছে, আবার গঙ্গাবিধৌতা বঙ্গভূমির রূপবর্ণনাও আছে, যেমন—'এই অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্রস্রোত-স্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়াচলে, আর কিছু কাশ্মীরে। জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না।' এই বর্ণনায় মেঘের নানা রঙ, হাওয়ায় তাল-নারকেল-খেজুর-গাছের মাথা চামরের মতো দোলা,—আম লিচু কাঁঠালগাছের সারি,—শ্যাম শ্যাম ঘাসের বিস্তার দেখা যায়। গঙ্গা, পদ্মা, দামোদর, বঙ্গোপসাগরের প্রসঙ্গ আছে,—১৭৭০-এ গঙ্গা নাকি শুকিয়ে গিয়েছিল, ৯ অক্টোবর, ১৭৩৪-এও নাকি সেইরকম ঘটেছিল, এসব তথ্য আছে। জাহাজের প্রসঙ্গ আছে। আবার 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' অংশের ভাষাভঙ্গির বিশেষত্বও ভোলবার নয়, যেমন—'আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন-রাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা।'

এই সঙ্গে তাঁর "বর্তমান ভারত" থেকে পূর্বোক্ত 'স্বদেশমন্ত্র' লেখাটির কয়েক ছত্র দেখা যাক—'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত' ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় উদ্ধৃতির ভঙ্গিকে বলা যায় গভীর আবেগের উচ্চগ্রাম। একে পরমাশ্চর্য গদ্যকাব্য বলতেই বা আপত্তি হবে কেন? এ যেন স্তব-স্তোত্রের কবিবচন। বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস"-এ কোনো কোনো অংশের গদ্যসুষমাতে যেমন ছিল করুণ-মধুর স্মরণের উল্লাস, এখানে ঠিক তা নেই,—আছে সুগভীর বেদনায় উচ্চারিত বাস্তব জীবনবোধের বন্দনা, যেমন —'ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই,…'

এই স্তোত্রের সুর ও সরল গম্ভীর শব্দসম্ভার তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভজনের ভাষার ক্ষেত্রে কতকটা ভিন্ন সুরে উচ্চার্য হলেও এরা মূলত একই শ্রেণীর বন্দনার প্রবাহ-ভেদ নয় কি?

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥

এটি অনুবাদ নয়—এ তাঁরই নিজের রচনা। এই ভজনটির বিশদতর পাঠান্তরও তিনি রেখে গেছেন। তাঁর "বীরবাণী"র 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' এই আত্ম-ময়তার আরো এক উচ্চগ্রামের বাণী—যা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির বাচক হয়ে উঠেছে—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

'সখার প্রতি'—'নাচুক তাহাতে শ্যামা', —'গাই গীত শুনাতে তোমায়'—এবং "সাগর-বক্ষে" সেই একই কবি বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা। এগুলির প্রবাহে নিহিত আছে সংযতবাক্ এক যোগীর ধ্যানদৃষ্টি। তাঁর গুরুভ্রাতা জি. সি. অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র ঘোষের কোনো-কোনো গানের সঙ্গেই এসব রচনায় মনোধর্মের কতকটা মিল অনুভব করা যায়। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের বহুমুখী স্পন্দনেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অনন্যতন্ত্রতা লক্ষণীয়। আমাদের সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির প্রতিফলন শুধু রসসম্ভোগের দিক থেকেই নয়,—তথ্য ও তত্ত্বের, বর্ণনা ও বিচারের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও অবশ্যই স্মরণীয়। স্বাধীনতা, সর্বধর্মসমন্বয়, নারীজাগরণ, শিক্ষাবিস্তার, সমষ্টিকল্যাণের লক্ষ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নানা প্রসঙ্গই বিবেকানন্দের বাণীতে, রচনায় চিঠিপত্রে বিদ্যমান।

গ্রন্থসমালোচনা

ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা ও মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতের সমাজব্যবস্থা মূলত কৃষিভিত্তিক। কৃষি-ব্যবস্থা, ভূমি, ভূমিরাজস্বব্যবস্থা এবং ভৌমিক শাসন-ব্যবস্থা ভারত-ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে জটিল গবেষণার বিষয়। ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকেই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তার ধারা আজও অব্যাহত আছে। ভারতীয় ধর্ম, জাতপাত ও রাজনীতিক সংস্কৃতি এবং মানবিক বিন্যাস এই কৃষিব্যবস্থার মধ্য থেকেই উদ্ভূত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে তিল-তিল করে গড়ে উঠেছে। এই ভাবনা এবং সংস্কৃতি আজ আমাদের মজ্জাগত।

এই ভাবনা এবং দ্বন্দ্বের নেপথ্য কুশীলব সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষক। তাঁরা কিন্তু মাঝে-মাঝেই ধর্ম এবং জাতিবিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একত্রিত হয়ে ঐক্য-বদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় সমাজে জাতিধর্মনির্বিশেষে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি আলাদা পথ তৈরি করে যুগজীর্ণ দ্বন্দ্বের নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা বারবার এই শান্ত নিস্তরঙ্গ ভারতবর্ষের শাসকদের তটস্থ করেছে। বারবার তাঁরা বুঝিয়েছেন যে ভারতবর্ষের মানুষের মূল ইতিহাস কৃষকসমাজের ইতিহাস।

ভারতের মানুষ ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রথমত, অনাচার আর শোষণের মাত্রা তীব্র হয়ে উঠলে কৃষকরা সরা-সরি অস্ত্র তুলে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন; এবং দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তরা সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন মেনে সরকারের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে দাবি পেশ করেছেন। শিক্ষা আর অর্থের জোরে এবং কিছুটা রাজানুগ্রহের বলে বাবু সম্প্রদায়ের রাজ-নীতিক প্রতিবাদী ধারাই পরবর্তী কালে নেতৃত্বের ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। কৃষকরা হলেন বাবু-নেতৃত্ব-মুখাপেক্ষী উলুখাগড়া।

কিন্তু কৃষক আন্দোলন তথা সাধারণ মানুষের সাবেকি আন্দোলনের চরিত্র একেবারে সম্পূর্ণভাবে কখনই লুপ্ত হয়ে যায় নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে মূল চরিত্র বজায় রেখে। সম্প্রতি সাতের দশকেও "কৃষিবিপ্লব" কথাটি খুব চালু হয়েছিল। এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা বিশ্লেষণ হয়েছে।

অধ্যাপক সুনীল সেনের আলোচ্য বইটি—"ভারতের কৃষক আন্দোলন ১৮৫৫-১৯৭৫" কৃষক আন্দোলনের মূল চরিত্রটি ধরার চেষ্টা করেছে। ১৮৫৫ থেকে ১৯৭৫—এই একশ কুড়ি বছরের দীর্ঘ আন্দো-লনের ইতিহাস তিনি অতিসংক্ষিপ্ত পরিসরে (২৬ পৃ. সূত্রনির্দেশসহ মাত্র ১৩৬ পৃ.) ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় তাঁর "অ্যাগরেরিয়ান স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬-৪৭" নামে প্রকাশিত (১৯৭২) ইংরেজি গ্রন্থেই আমরা পেয়েছি। বর্তমান বইটিতে তার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

বইটির নামকরণে যদিও "কৃষক আন্দোলন" কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন, বইটির শুরু তিনি করেছেন "কৃষক বিদ্রোহ" দিয়ে। যেক্ষেত্রে, শুরুরও শুরুতে "বিদ্রোহ" আর "আন্দোলনে"র প্রকৃতিগত পার্থক্য আর তাৎপর্য নির্ণয়ের সুযোগ ছিল। সাধারণভাবে এ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য না করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু নেতৃত্বের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গেলে "বিদ্রোহ" এবং "আন্দোলন" শব্দ দুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। লেখকের কাছে তা গুরুত্ব পায় নি।

লেখক ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন কিন্তু ১৮৫৭ সালের "সিপাহি বিদ্রোহ"-কে তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। "সিপাহি বিদ্রোহ" কি শুধু সিপাহিদেরই বিদ্রোহ ছিল? এই বিদ্রোহের মধ্যে কৃষক আন্দোলন বা বিদ্রোহের কোনো বস্তুই কি ছিল না? কমিউনিস্ট-দের মধ্যেও এ বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবনা-চিন্তা আছে। ভারত-ব্যাখ্যাতা রজনী পাম দত্ত (*India Today*) বা একদা সাম্যবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায় (*India in Transition*) এই বিদ্রোহকে কেবল সিপাহিদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ বলেই নিন্দা করেছেন। আবার কার্ল মার্কসের বিভিন্ন রচনায় এর তাৎপর্য স্বীকার করা হচ্ছে। অনেকে একে "মহাবিদ্রোহ" নামেও অভিহিত করছেন (প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য ঐতিহাসিক)। এসব বিষয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্যই সংঘটিত হয় নি। এর পেছনে আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বজাতিপ্রেমের প্রেরণাও কাজ করেছে। হয়তো আধুনিক কেতাদুরস্ত মানদণ্ডের বিচারে এগুলিকে স্বাধীনতা বা জাতীয় সংগ্রাম বলা যায় কিনা তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। লেখকের মতে: 'বস্তুত এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে সচেতন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য ছিল না' (পৃ ৯)। 'কিন্তু ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এই বিদ্রোহগুলির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলছেন: 'বস্তুত, সাঁওতাল বিদ্রোহ পরিণত হয় ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহে' (পৃ ১১)।

একথা সত্য যে ভারতের নিরক্ষর এবং তথাকথিত অশিক্ষিত কৃষকরা মিল, বেন্থাম, পেন, মার্কস এইসব পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনা পড়েন নি বা ফরাসি বিপ্লবের বাণী তাঁদের কানে পৌঁছায় নি। কিন্তু নিজের মতন করেই তাঁদের মাতৃভূমিকে তাঁরা ভালো-বেসে ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ কী, ঔপনিবেশিক অর্থ-নীতির প্রকৃতি কী রকম ইত্যাদি বিশ্লেষণের অপেক্ষা না রেখেই তাঁরা আন্দোলন আর বিদ্রোহ করেছিলেন। 'সচেতন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনায়' তাঁরা হয়তো সমৃদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কালের সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী চেতনামন্থনে উত্থিত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের উল্লাসিকতা তাঁদের আচ্ছন্ন করে নি। বুদ্ধিজীবীরা বা ভদ্র রাজনীতির পুরোহিতরা চিরদিনই তাঁদের অপাংক্তেয় বিবেচনা করেছেন। এ কথা লেখকও স্বীকার করছেন: 'সাঁওতালদের জন্য শহরের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামান্যই সহানুভূতি ছিল।' উদার-পন্থী পত্রিকা "সোমপ্রকাশ" শহরগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করার প্রস্তাব জানিয়েছিল। যার ফলে বিদ্রোহীরা জঙ্গলে থাকতে বাধ্য হয়। "সংবাদভাস্কর" এই অভিমত প্রকাশ করে যে 'বিহারের বিধর্মী মুসলমানরা এই মর্মে গুজব ছড়াচ্ছিল যে সাঁওতালদের নবজাগরণ শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য করবে।'

আসলে কৃষক আন্দোলন যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, সেখানে তারা দেশী বা বিদেশী হিসাবে শোষকদের শ্রেণীবিন্যাস করে নি। শোষকমাত্রেই

ভারতের কৃষক আন্দোলন: ১৮৫৫-১৯৭৫—ড. সুনীল সেন। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স (১৯৯০) কলিকাতা-৯। চল্লিশ টাকা।

আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেখানে আন্দোলনের পুরোধা, সেখানে আন্দোলন নানা গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ ও তত্ত্বের জাড্যে বাঁধা পড়েছে।

নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), পাবনার কৃষকবিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রের কৃষকবিদ্রোহ (১৮৭৫), গান্ধীপর্বের ভারতীয় রাজনীতির জমি বহু আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু ভারতীয় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতারা এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি।

লেখকের মতে, 'গান্ধীপর্ব' থেকে কৃষকদের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ...১৯২০ সালের পর থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের কৃষক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সংযোজন সাধন করল (পৃ ২৮)। কংগ্রেস আন্দোলন ছিল মূলত 'সরকার-বিরোধী'। জমিদার-বিরোধিতার দিকটি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। প্রথম দিকে কৃষক আন্দোলন বা বিদ্রোহ ধর্ম থেকেও তত্ত্বগত শক্তি অর্জন করেছিল। উত্তরপ্রদেশে বাবা রামচন্দ্র নামে এক সন্ন্যাসী কৃষকদের মধ্যে রামায়ণপাঠের মাধ্যমে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিলেন। কৃষকবিদ্রোহ যতই ছড়িয়ে পড়েছে, জাতীয়তাবাদী নেতারা ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা শক্ত হাতে লাগাম ধরে কৃষকদের ভদ্র পথে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে কালক্রমে গড়ে ওঠে কৃষকসভা। স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গি বিদ্রোহ ক্রমশ সুচিন্তিত ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে। বাঙলার মেদিনীপুরে ১৯২১ সালে করসংগ্রহের যন্ত্র ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। পরবর্তী কালে ১৯২৫ সালে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী আর কর্মীরা "দ্য লেবর স্বরাজ পার্টি অব দি ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" গঠন করেন। এ সময় শ্রমিক-কৃষকদের মুখপত্র সাপ্তাহিক "লাঙল" প্রকাশিত হয়, যার প্রধান পরিচালক ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম।

১৯৩৫ সালের মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, মালাবার, গুজরাত, পানজাব এবং বাঙলায় কৃষকসভা গঠিত হয়। এই কৃষকসভা ও কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টি 'জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতে'র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করে। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ও ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ ১৯৩৬ সালে এপ্রিল মাসে লখনউতে একই মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক সেন অবশ্য কৃষকসভাগুলি সম্বন্ধে গতানুগতিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন নি। এর চরিত্রবিশ্লেষণে তিনি যত্নবান। ১৯৩৬ সালের সারা ভারত কৃষক সভার কর্মসূচী সম্বন্ধে তিনি বলছেন: 'কৃষিবিপ্লব ভবিষ্যতের গর্ভেই রয়ে গেল' (পৃ ৫১)। নেতারা মূল সমস্যা থেকে কৃষকদের সরিয়ে 'সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ঐক্যের তত্ত্ব নিয়ে ক্লান্তিকর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।' ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারত কিষাণ সভার নেতৃত্বে যেসব বুদ্ধিজীবী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন তাঁদের শ্রেণীপরিচয় আর শিক্ষার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও অধ্যাপক সেন দিয়েছেন। প্রকৃত কৃষকবিদ্রোহ ছিল তাঁদের চিন্তাভাবনার নাগালের অনেক বাইরে।

কৃষক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের মেলবন্ধনের সর্বোচ্চ পর্ব লক্ষ করা গেল ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে। বিপুলসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল উচ্চবর্ণের নিয়ন্ত্রণে।

অগস্ট আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টরা আত্মঘাতী "জনযুদ্ধে"র নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলনের জোয়ারে সর্বত্র তাঁরা অনড় থাকতে পারেন নি। ইংরেজঘেঁষা নীতি গ্রহণ করে তাঁদের এক রকম আত্মতুষ্টিও ছিল। মেদিনীপুরে ভূপাল পাণ্ডার নেতৃত্বে আন্দোলন ও তাঁর জেলখাটার ঘটনা উল্লেখ করে লেখক কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানপর্বে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে এল তখন কমিউনিস্টরা শহরাঞ্চলে জঙ্গি আন্দোলন শুরু করলেন। 'কৃষির রণাঙ্গনে তখন বিরাজ করছিল শান্ত নৈঃশব্দ্য। এই ঝড়ো কালপর্বে কৃষকরা সংগ্রামে নামেন নি' (পৃ ৮৯)। সমস্ত উত্তেজনা তখন শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্তদের চাঁদোয়ার তলায়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব", "সংবিধানপরিষদে জনগণের ক্ষমতা", কংগ্রেস-মুসলিম লীগের নেতৃত্বে "ঐক্যবদ্ধ মোর্চা" বা জাতীয় সরকার গড়ে তোলার শ্লোগান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

যান্ত্রিক বিপ্লববাদের নেশায় তাঁরা এতই বুঁদ হয়েছিলেন যে 'সাম্প্রদায়িকতা দেশের কত গভীরে প্রবেশ করেছে বামপন্থীরা বুঝতে পারেন নি।' এই পটভূমিতে অবশ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা তেভাগা আন্দোলনের সূচনা করে (১৯৪৬)। এই আন্দোলনে বর্তমান গ্রন্থের লেখকও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন কেন প্রত্যাহৃত হল, সে সম্পর্কে আলোচনা থাকলে ভালো হত।

একটা সত্য আজ পরিষ্কার। ভারতের যে-সমস্ত অঞ্চলে কমিউনিস্টরা এক সময় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সে-সমস্ত অঞ্চলেই তাঁদের কিছু প্রভাব বা অস্তিত্ব চোখে পড়ে। সেই আন্দোলনের ধারা আজ সংসদীয় রাজনীতির জোগানদারের ভূমিকা পালন করছে। "তেলেঙ্গানা" ও "কাকদ্বীপের" (শিশু তেলেঙ্গানা) আন্দোলনের পর ভারতের কমিউনিস্টরা ভারতীয় রাজনীতির সংসদীয় পদাতিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। লেখকের 'মনে হয়েছে' পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল 'বাস্তবের স্বীকৃতি' (পৃ ১২৫)। 'নেহরুপর্বে ভারতের কোথায়ও জঙ্গি কৃষক আন্দোলন দেখা যায় নি।' ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙন, পৃথক কৃষকসভা, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের হাতে কৃষক নেতৃত্ব—এ-সমস্তই কৃষক আন্দোলনকে দুর্বল করেছে ও বিপ্লবী আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে।

১৯৬৭ সালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস সরকারের ক্ষয় আর ভাঙন শুরু হয়। এই সময়ে কৃষক আন্দোলনে 'নতুন জোয়ার দেখা গেল।' জমি দখলের জন্য সবচেয়ে জঙ্গি আন্দোলন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রনটের আমলে, যার পরিণতি হিসাবে জন্ম হল ঐতিহাসিক "নকশালবাড়ি" আন্দোলনের, এবং জন্ম নিল সি. পি. আই (এম) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সি. পি. আই (এম-এল) পার্টি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "নকশালবাড়ি"-আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে (১৯৬৭ সালে) জমি দখলের আন্দোলন হলেও মূলত তা হয়ে দাঁড়াল "শোধনবাদ" ও "বিপ্লবী আন্দোলনে"র আদর্শগত সংগ্রাম, যা তামাম ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন আদর্শগত বিতর্কের সূচনা করেছিল।

নকশালবাড়ির আন্দোলনের পরবর্তী দুর্বলতা সত্ত্বেও লেখক এই আন্দোলনের 'ইতিবাচক অবদানে'র কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন 'বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মুষ্টিমেয় কর্মী কয়েকটি অঞ্চলে তৃণমূল কাজ করে গরিব কৃষকদের ঐক্য গড়ে তুলতে ব্রতী ছিলেন। সম্ভবত এই কারণে নকশালপন্থীদের প্রভাব মুছে যায় নি শাসকশ্রেণীর পরিচালিত হিংস্র দমননীতি সত্ত্বেও। অনেক আত্মত্যাগী নকশালপন্থী কর্মী জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত' (পৃ ১৪০)।

বইটির শেষ কথা অষ্টম অধ্যায়ে। লেখক কৃষক ও কৃষি আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কিত তত্ত্বের ও কর্মসূচির আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারত ও চীনের কৃষক আন্দোলনের তুলনা করে বলেছেন, 'চীনের তুলনায় ভারতের কৃষক আন্দোলন অনেক দুর্বল।' এরিক উলফ্, ব্যারিংটন মুর, সেমোঁর, পেত্রাহাইডরিস এবং 'সাবঅলটার্ন' তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত অনুধ্যানযোগ্য।

একশ কুড়ি বছরের কৃষক আন্দোলন এবং তার

তত্ত্বগত আলোচনা মাত্র একশ চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক সহজ সরল ভাষায় নিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন। কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল এই বইটি পড়লে অবশ্যই বাড়বে।

তবে বইটির শুরুতেই একটি খটকা জাগে। লেখক ও প্রকাশক উভয়েই জানাচ্ছেন যে 'ভারতের কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো বই অদ্যাবধি বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি।' হাতের কাছে আর কোনো বই না পেলেও অন্তত পক্ষে চব্বিশ বছর আগে প্রকাশিত সুপ্রকাশ রায়ের (সুধীর ভট্টাচার্য) "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" এবং "ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১৯০১-১৯১৮)" বইটির উল্লেখ করা যায়। এই দুটি বইতে সমস্ত না হলেও (যা সুনীল সেনও করেন নি) বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে কৃষক আন্দোলনের বিবরণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। লেখক কী করে এই বই দুটিকে এড়িয়ে গেলেন তা বোঝা গেল না।

পরিশেষে, শিক্ষক সুশোভন সরকারের (ইতিহাসের) ধারা অনুসরণ করে রচিত এই গ্রন্থটি পাঠকসমাজে আদরণীয় হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা

সুজিৎ ঘোষ

ভারতের মতো কোনো দেশ দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনের অধীনে থাকলে, সামগ্রিকভাবে সে দেশ পিছিয়ে পড়বেই। অর্থনীতি আর রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা শিক্ষা ও শাসনতন্ত্রে প্রভাব ফেলবে—এও স্বতঃসিদ্ধ। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের উপনিবেশ হিসেবে গত দু-শ বছরের ইতিহাস আজকের ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান আর বিকাশের প্রেক্ষাপট। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ইংরেজ শাসকের রাষ্ট্রীয় শাসন এবং রাজনৈতিক স্বার্থেই তৈরি হয় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। সে শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং চিত্তের মুক্তি নয়। পরীক্ষা পাশের জোরে শাসনতন্ত্রের নানা উঁচু-নীচু পদের দখল পাওয়াই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে—দেশের বিশাল দরিদ্র সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যে ও দাপটে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিজীবী সমাজের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু, সব নিয়মের ব্যতিক্রম থাকে। বিদেশী শাসক তার ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত ফল যে সর্বদা পেয়েছে, তা নয়। পরাধীন দেশের বিকাশের নিজস্ব দ্বান্দ্বিকতায় এই শিক্ষার মধ্যে থেকেই প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। উপনিবেশের ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে জনমতকে জাগ্রত ও সংগঠিত করার সূচনা ও বিকাশ এই ঔপনিবেশিক-শিক্ষাব্যবস্থাজাত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই ঘটেছে।

কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী কালে দেশের বহু সমস্যার মতো বুদ্ধিজীবীদের বহু সমস্যা থেকে গেছে; বুদ্ধিজীবীদের বিকাশে যে সমস্যাগুলি ছিল, সেগুলি তো থেকে গেছেই, তার সঙ্গে উত্তর-স্বাধীনতাপর্বের সার্বিক বেকারি দেশভাগ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমস্যাগুলি এক জটিল মাত্রা লাভ করেছে। ইংরেজ শাসনকালে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের বিভেদটা ছিল সরল—তাদের বিকাশের অভিমুখিতার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তা হল বুদ্ধিজীবীদের এক পক্ষ বিদেশী শাসকের শাসন-বিচার-সংস্কৃতির পক্ষে থেকেছে, বিদেশী শাসকের সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। অন্য-ধারার বুদ্ধিজীবীরা স্বদেশকে তুলে ধরেছেন, স্বদেশের জন্যে বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুখকর জীবন-যাপনের সুযোগও ত্যাগ করেছেন।

বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব ও সাহিত্য-সমাজে অবক্ষয়—ইসরাইল খান। স্বকীয়তা প্রকাশালয়, ১৮৯। ঢাকা। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে বুদ্ধিজীবীদের বিকাশের অন্যতম প্রধান সমস্যাটি হল : বিদেশী শাসকের সমর্থক ও বিরোধী—এই ভেদরেখাটি প্রত্যক্ষভাবে লুপ্ত হয়েছে। দেশপ্রেমজাত ত্যাগের উন্মাদনাও বুদ্ধিজীবীকে ব্যাকুল করে না। স্বাধীনতা যৌবন অতিক্রম করেও উপমহাদেশের রাজনৈতিক-অর্থ-নৈতিক ও নৈতিক জীবনে সুস্থির আশাবাদ সৃষ্টি করে নি, এমনকী বিদেশী শাসকের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল ছক ও লক্ষ্য পর্যন্ত মূলগতভাবে গত তেতাল্লিশ বছরে পালটায় নি। অথচ বিকাশের সুযোগও বাড়ে নি, শুধু পুরনো ক্ষেত্রগুলিতে কিছু পদবৃদ্ধির ফলে সুযোগের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে বিরোধ চলে। স্বাধীনতাপূর্ব বুদ্ধিজীবীদের দুই যুযুধান শিবিরের মধ্যে ভেদরেখা মুছে দেবার যে সুযোগ উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে এসেছিল, তা আজ বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বিরোধে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ থাবা সরিয়ে নিলেও, 'ঋণ', 'অনুদান', 'সাহায্য', 'সংস্কৃতিবিনিময়' কর্মসূচি ইত্যাদি নানা উপকারের আড়ালে সমগ্র বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলিকে পদানত রাখতে চায়। এই উপমহাদেশের দেশগুলিও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

ইসরাইল খান তাঁর গ্রন্থের সন্নিবেশিত সাতটি প্রবন্ধে বুদ্ধিজীবী সমাজের বিরোধ ও তার ফল হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্য, সমাজের অবক্ষয়ের চেহারাটা ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময় নানা উপলক্ষে রচিত। ফলে কিছু পুনরাবৃত্তি পাঠকের চোখে পড়বে।

এ আলোচনা সূত্রপাত হিসেবে স্বাগত। কিন্তু সমস্যার গভীরতা বিশ্লেষণ ও সমাধান আরও বহু সংঘবদ্ধ বিতর্ক-বিশ্লেষণ-প্রয়াসের দাবি রাখে। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটি ("মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা") বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। ভারতেও একই লক্ষণ ও ধারাগুলি প্রত্যক্ষ করা যাবে। অবশ্য "মুৎসুদ্দি"-নামক পরনির্ভর একটি অর্থনৈতিক সংজ্ঞার্থবর্গকে সাংস্কৃতিক বর্গ হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে,—যে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি বাগোষ্ঠী সাম্রাজ্য-বাদের দালাল, তারা দালালই। 'মুৎসুদ্দি' নামকরণে নতুন করে চিহ্নিত করলে তাদের উন্নতি বা অবনতি হয় না। আর, আমরা যারা বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণতা থেকে এগোতে চাই, তারাও অচেতনে ইতিহাসের অমোঘ শিকার কখনো-কখনো। তাই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের উল্লেখ করে, প্রবন্ধটি সমস্যার কতটা সমাধানে সহায়ক হবে, সেকথা না ভেবে, 'উক্ত প্রবন্ধে নির্দেশিত সূত্র অনুসরণ করেই এ-বিষয়ে একাধিক পি. এইচ.-ডি. সন্দর্ভ রচিত হতে পারে' (পৃ ১১) বলে লেখক তৃপ্ত হন কিভাবে? এ-রকম চোরা ভাবনায় ঔপনিবেশিক শিক্ষার চোলাইয়ে অ্যাকাডেমিক সাফল্যের কেরিয়ারে সিঁড়ি তৈরির রাস্তায় বুদ্ধি-জীবীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মুক্তি নেই। সে বিষয়ে তো প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীদেরই অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

বইটির দাম বাংলাদেশী টাকায় পঁয়তাল্লিশ—এত দামের ১২৬ পৃষ্ঠার বই কি যাঁরা মুৎসুদ্দি নন, সাধারণ বুদ্ধিজীবী—তাঁদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পড়বে? আলোচ্য বিষয়ে ইসরাইল খানের আরও পরিণত ও সুচিন্তিত গ্রন্থের জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে পারি।

প্রসঙ্গ বাঙলা পরিভাষাচর্চা, বাঙলা কাব্যচর্চার প্রথম পর্ব, বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি

রণেন্দ্রনাথ দেব

বাঙলা কবিতার সংকলনগ্রন্থ নিতান্ত অল্প নয়। "আবহমান বাংলা কবিতা" নবীনতম সংকলন। চর্যাগীতি থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত কালসীমায় অসংখ্য কাব্য রচিত হয়েছে। এত কাব্য থেকে বেছে একটি সংকলন তৈরি করা সহজসাধ্য নয়। প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে—সংকলন-কর্তা কোন্ বিশেষ রীতি অবলম্বন করেছেন? কিভাবে কবিতাগুলিকে বিন্যস্ত করা তাঁর অভিপ্রায়—কালানুক্রমিক না বিষয়ানুযায়ী, না কবিপরম্পরামূলক? এই রীতিগুলির কোনো একটি তিনি অনুসরণ করেন নি। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'এই সংকলন, নেহাতই একজন পাঠকের করা, নিরভিমান ও সংস্কারহীন।' বোঝা গেল, সম্পাদকের ব্যক্তিগত রুচি আর পছন্দ অনুযায়ী কবিতাগুলি নির্বাচিত হয়েছে। আপত্তি করার কারণ দেখি না। কিন্তু বাঙলা কবিতার একটি নির্ভরযোগ্য আকরতুল্য সংগ্রহ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তা সত্ত্বেও সংকলনটিকে মূল্যহীন বলা সমীচীন নয়। ন-শো বছরের বাঙলা কবিতার একটা রূপরেখা এতে অবশ্যই আবিষ্কার করা যায়। কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছে বিভিন্ন ব্রতের মন্ত্রগুলি এবং অজ্ঞাত কবিদের রচনাসমূহ। সম্পাদক সাহস করে আমিনা বিবি ও নছর মামুদ-পালা, চলন বিলের মেয়েলি গান, বগুড়া জেলার বিয়ের গান, আঁতুড়ঘরের গান প্রভৃতিকে এ সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন। দুয়েকটি ছোটো-ছোটো চূর্ণ কবিতা নজর কাড়ে:

> ছোটলোকের ছাওয়া যদি বড় বিষয় পায়।
> টেরিয়া করি পাগড়ি বান্ধি ছায়ার দিকে চায়।
> বাঁশের পাতারি নাকান ফ্যারফ্যারিয়া বেড়ায়।
> (অজ্ঞাত : ভুঁইফোঁড়)

> সাঁজের বেলা জলকে গেলে দুটি শেয়াল হলকে—
> আমরা কি বলে যাবো জলকে।
> হাত দুটা নাইড়ে দিলে লইতন চুড়ি ঝলকে—
> (অনামিত : ঝুমুর)

> আমগাছে আম নাই ঢিল কেন ছুঁড় হে
> তোমার দেশের আমি নই, আঁখি কেন ঠার হে—
> (অনামিত : দাঁড়ঝুমুর)

শেষের দিকে প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে 'প্রসঙ্গকথা'। কবিদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। এ অংশটি পড়ে ছাত্র নন এমন পাঠক উপকৃত হবেন। ছাত্রেরা অবশ্য আরেকটু বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী আশা করবেন। তবে ছাত্রদের প্রয়োজন মেটানো এ সংকলনের উদ্দেশ্য নয়।

ড. দিলীপকুমার দত্তের বইটি পুরোপুরি ছাত্রদের মুখ চেয়ে লেখা। বাঙলা বৈষ্ণব কাব্য সম্বন্ধে জানতে গেলে যে বিষয়গুলির উল্লেখ অপরিহার্য, সমালোচক সেগুলি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু বইটি পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ হওয়ায় আলোচনায় কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রম নেই, স্পষ্ট পূর্ণাঙ্গতাও নেই। তবু বৈষ্ণবতত্ত্বজিজ্ঞাসু, রসপিপাসু পাঠকদের কাছে আলোচনাটি সমাদৃত হবে বলে মনে হয়।

প্রথম প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন, মুক্তিভাবনা নয়, নির্মল ও নিরুপাধি প্রেমভাবনাই বৈষ্ণবধর্মের একমাত্র সাধনা এবং সাধনলক্ষ্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, রাধা-পারম্যবাদের সঞ্চারে কবি জয়দেবের অবদানের কথা। বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম যে স্থান লাভ করেছিল তার প্রধান কারণ চৈতন্যদেবের উদার প্রেম-মহিমা ও বিরাট ঐতিহাসিক মর্যাদা—তৃতীয় প্রবন্ধে তা পরিস্ফুট। চতুর্থ প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বীজ অন্বেষণ করা হয়েছে বেদান্তে। পঞ্চম প্রবন্ধে দেখি, প্রচলিত কাব্যরসতত্ত্বের পথ ধরে গৌড়ীয় রসতত্ত্বের জগৎ বিবর্তন লাভ করে নি। তাহলেও এর স্বাতন্ত্র্য এবং মাধুর্যরসের গৌরবমণ্ডিত রূপটি উজ্জ্বল। ষষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন—ভক্তিসাধনার বিকাশ-ধারায় মহাভাবসাধিকা শ্রীরাধার বিবর্তন। শেষের দুটি প্রবন্ধ কবি চণ্ডীদাস আর কবি জ্ঞানদাস বিষয়ে।

লেখকের আলোচনারীতি জটিল নয়। তিনি সংস্কৃত কাব্য এবং দর্শন থেকে প্রচুর অংশ উদ্‌ধৃত করেছেন। এগুলির যৌক্তিকতা বিচার করার মতো জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি আমার নেই, তবে পড়তে ভালো লেগেছে। সর্বশেষে আছে গ্রন্থপ্রসঙ্গ। কিন্তু পদ্যাবলীর ভূমিকায় ড. সুশীলকুমার দে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার কোনো উল্লেখ না দেখে বিস্মিত হলাম।

ড. রত্না ঘোষের "বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর" বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির জন্য অনুমোদিত অভিসন্দর্ভ। গবেষণাগ্রন্থ হলেও বইটি সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাবে।

লেখিকা বলেছেন, 'বাংলা পরিভাষা-চর্চার সূত্রপাত ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সেদিন থেকে পরবর্তী দু শ বছরে (১৭৮৪-১৯৮৪) বিদেশী প্রকাশক ও মিশনারী আর দেশী বিজ্ঞানী ও গদ্যলেখকের মেধা ও প্রযত্নে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা পরিভাষা, এই গ্রন্থ তারই আনুপূর্বিক ইতিহাস।'

স্বীকার করতে বাধা নেই—আলোচনাটি গতানুগতিক নয়। ভারতে পরিভাষাসৃষ্টির সূচনা ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানে তিনি সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষায় যেসব বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে বিশেষত আইনের অনুবাদ আবশ্যিক হওয়ায় পরিভাষা সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠী (কেরি-মৃত্যুঞ্জয়-রামনাথ - রাজীবলোচন - গোলোকনাথ - চণ্ডীচরণ-তারিণীচরণ-হরপ্রসাদ-কাশীনাথ-পদ্মলোচন-রামরাম), শ্রীরামপুর মিশনারি গোষ্ঠী (কেরি, টমাস, মার্শম্যান ও থার্ড), এবং ইংরেজ প্রশাসক গোষ্ঠী (ডানকান, এডমন স্টোন, ফরস্টার, রবিনসন, উইলসন, আপজন, মিলার) সচেতনভাবে পরিভাষা-নির্মাণে ব্রতী হন নি। তথাপি তাঁদের লেখার মধ্যেই পরিভাষা নির্মাণের প্রথম পরিচয় পাই।' বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা রচনার সূত্রপাত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। ফেলিকস কেরি, জন ম্যাক বিজ্ঞানের যেসব পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ করেন সেগুলো বেশ কৌতূহল-জনক। এ কাজে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিপিনবিহারী দাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় ও রাজশেখর বসু পরবর্তী কালে ব্রতী হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিভাষা রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। লেখিকা সংক্ষেপে বাংলাদেশের পরিভাষাচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিভাষাসৃষ্টিতে কী অসাধারণ দান রেখে গেছেন তার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখিকা হিন্দি পরিভাষার বিচার করেছেন এবং সংস্কৃতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে পরিভাষা রচনার কাজ ব্যাহত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। দু শ পৃষ্ঠার বইয়ে দু শ বছরের

আবহমান বাংলা কবিতা—প্রথম পর্ব: চর্যাগীতি—ঈশ্বর গুপ্ত—মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত। সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা ৪৮। নভেমবর ১৯৮৯। ২১৬ পৃষ্ঠা। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বৈষ্ণব দর্শন ও রসলোক—ড. দিলীপকুমার দত্ত। অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯। ডিসেমবর ১৯৮৯। ২১৩ পৃষ্ঠা। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর—ড. রত্না ঘোষ। সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৬। নভেমবর ১৯৮৮। ২০২ পৃষ্ঠা। চল্লিশ টাকা।

ইতিহাস বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দুয়েকটি অনুল্লেখদোষ চোখে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় যেমন সাহিত্যসমালোচনার পরিভাষা প্রকাশ করেন তেমনি বুদ্ধদেব বসু "কবিতা" পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় সমালোচনার পরিভাষা বার করেন। এ লেখাটির উল্লেখ নেই কেন? সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সৃষ্ট পরিভাষার কথা বলা কর্তব্য ছিল।

এ গ্রন্থটি পড়ে আমার মতো অনেকেই উপকৃত হবেন। বিশেষত বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের এ বইটি দেখতে অনুরোধ করি।

ন-টি কবিতার বই, দুটি গল্পগ্রন্থ এবং দুটি উপন্যাস

সুব্রত সরকার

বর্ষীয়ান কবি সন্তোষকুমার দে-র এ-যাবৎ রচিত কবিতার নির্বাচিত এক সঞ্চয়নগ্রন্থ এটি। সুতরাং কবির আপাতত সম্পূর্ণ কাব্যজীবনকেই পরিক্রমা করার সুযোগ পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে। কবির চিন্তা, ভাষা, দর্শন কিভাবে সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে, তা পাঠক অনুভব করতে পারবেন। যদিও তাঁর সমগ্র কাব্যকৃতির এক সামান্য অংশই এ গ্রন্থে রয়েছে, তবু তাঁর আটটি গ্রন্থের স্ব-নির্বাচিত কবিতায় এই সঞ্চয়ন-গ্রন্থটি তাঁর পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ করে দিয়েছে। 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন'—একদা প্রবাদপ্রতিম এই বিজ্ঞাপনটির রচয়িতা কবি সন্তোষকুমার দে বাঙলা সাহিত্যের বহু যশস্বী মানুষের স্নেহ আর প্রশংসা লাভ করেছেন তাঁর কবিতার কাব্যগুণ এবং ছন্দের সুরধ্বনির জন্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষক হিসাবে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনকে পেয়েছিলেন। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্যের একজন গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। গ্রন্থের প্রথমে কবি তাঁর এই শিক্ষাগুরু ও কাব্য-উৎসাহদাতার ছবি ছেপে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন। অনেকেই হয়তো এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করবেন, কিন্তু কবির জীবনে যদি সত্যই এমন কেউ জড়িয়ে থাকেন তবে তাঁকে স্বীকার করার এই সরলতা বা সাহস করে তার এমন উচ্ছ্বাসময় প্রকাশ প্রমাণ করে কতখানি গভীর ওঁদের সম্পর্ক। কবির হৃদয়ের মাটি এমনই নরম, আর্দ্র, দুঃসাহসী—সন্তোষকুমার দে-র কবিতাগুলিতেও তাঁর এই স্পর্শকাতর মনটি বারবার দেখতে পাওয়া যায়। আজকের কবিতাচর্চার ইতিহাসে হয়তো তাঁর জায়গা হবে না, কবিতার আঙ্গিকগত প্রকরণ-শৈলীর দিক থেকে হয়তো কবিতাগুলিকে তত আধুনিক মনে হবে না, কিন্তু আন্তরিকতা আর হৃদয়ের উষ্ণ ছোঁয়ার উৎসবে কবিতাগ্রন্থটি বহু পাঠকের স্মৃতিতে জীবিত হয়ে থাকবে—এই আশা করা যেতে পারে।

নির্মল হালদার এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। বাঙলা কবিতায় তাঁর উচ্চারণভঙ্গিকে অনেকেই অনুসরণ করছেন, এ নিশ্চয় এক সাফল্য। তার আন্তরিকতা, কাব্যের সরলতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা—এ সবই আমাদের মুগ্ধ করে, আবেগাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু এর পরেই কবির বিপদ শুরু হয়, আমাদেরও। এ সংশয় নির্মলকেও অমলিন রাখতে পারে নি। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর হাহাকার কাব্য-গ্রন্থের পাতায়-পাতায় শীতের হিমেল বাতাস এনে কাঁপিয়ে যায়। নির্মল লিখেছেন: 'শুধু মাটি-মানুষ, জল-হাওয়া, ভাত-কাপড়ের কথা, তা দিয়ে কদ্দিন কবিতা লেখা যায়?' যথার্থ এক কবির অন্বেষণ এবং আর্তি ফুটে ওঠে ভূমিকায়। কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে এই মায়ার জগৎ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা নেই, এমনকী এই মায়ার জগৎ ছেড়ে যাওয়া যে স্থির ভবিতব্য, তা জেনেও তিনি অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করেছেন। কবির এই অসহায়তা আমাদের দুঃখিত করে। নির্মল কি তবে এবার থেমে যেতে চান? নিজেকে অনুসরণের বৃত্ত গত বছরগুলিতে তিনি ক্রমাগত পাক খাচ্ছেন। আর ব্যবহারে-ব্যবহারে, তাঁর ব্যবহৃত কাব্যভাষা হয়ে উঠেছে স্বাদগন্ধহীন এক অভ্যাসের রতিক্রিয়া, যেখানে নতুন জন্মের জন্যে প্রার্থনা নেই। রহস্যহীন তাঁর কবিতাপ্রতিমার কাঠামো, খড় বেরিয়ে এসেছে। সমস্ত পূর্ব-প্রশংসা, উৎসাহ, ভাষাকে ময়লা কাপড়ের মতো পরিত্যাগ করে তিনি যদি কল্পনার পিঠে ডানা লাগিয়ে অনুসন্ধানের নতুন পৃথিবীতে না যেতে চান, তবে তাঁকে নিয়ে আমাদের আর কৌতূহল থাকবে না। আর কে না জানে কৌতূহল ফুরিয়ে গেলে বেঁচে থাকা অসভ্যতা। নির্মলের মতো প্রাণময়, আন্তরিক কবির কাছে আমরা অনেক উৎসারণের আশা করি। কিন্তু আলোচ্য "বিবাহমঙ্গল" কাব্যগ্রন্থটিতে সেই পুরনো নির্মলই রয়ে গেছেন। যদিও এ গ্রন্থেও নির্মলীয় সৌন্দর্যের ঝিলিক আমাদের তৃপ্ত করে কখনও-কখনও। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিকে আমার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। নিরাভরণ ভাষায় মৃত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগকে কত সংহত করে বলা যায়, তার এক চমৎকার উদাহরণ এই কবিতা। এ ছাড়া সাত পৃষ্ঠায় তিন ভাইকে যখন বেলপাতার সঙ্গে তুলনা করেন, আমরা চমকে উঠি। কিন্তু আমাদের বিষণ্ণ হতে হয় যখন নির্মল লেখেন: 'গিরিবালার নাকের ফুটোয়/ফুল গুঁজে দেবো।' নির্মল কি জানেন না—যাদের ঘরে সোনা নাই, রুপা নাই, তারা ফুল ফুটিয়ে ফুল গুঁজে দেবার বিলাসকেও বহন করতে পারে না। ওসব শহুরে রোমানটিকতা, যার ছোঁয়া কৃত্রিম করে দিচ্ছে গ্রামের নিজস্ব জীবনভঙ্গিকেও। বোঝা যায় নির্মলও এর শিকার হয়েছেন। নির্মলের লেখায় কল্পনা বেশি নেই, রহস্যও ছিল না, কিন্তু প্রসন্নতার অভাব কখনই আমরা দেখি নি। দরিদ্র, অভাবী মানুষদের বেঁচে থাকার নিজস্ব আলো ভোর-বেলার তারার মমতা নিয়ে তাঁর কবিতায় ফুটে থাকত। 'গিরিবালার নাক বিঁধালো/কই হে অকলু, চলো চলো ফুল ফোটাতে যাই।' এই কাব্যসম্ভাবনাময় পঙক্তির কী করুণ পরিণাম। মেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে, পিতা টের পাচ্ছেন, হাঙ্কা ঠাট্টার চালে তিনি যে কথা বলেন তার প্রসাদগুণ উবে গেল শেষ পঙক্তিতে।

"স্বরাহত নিষাদ" পাঁচজন কবির সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ। একই গ্রন্থের মলাটের মধ্যে পাঁচজন কবিকে খুঁজে পাওয়া পাঠকের অতিরিক্ত লাভ। জ্যোতির্ময় দাশ আলোচ্য কাব্যসংকলনের প্রথম কবি। দীর্ঘ পঙক্তি ও একটু বিস্তার করে কথা বলতে ভালোবাসেন জ্যোতির্ময়, ফলে কখনও ক্লান্ত লাগে। একটু রিপোর্টাজের ধরন, সামাজিক চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক অর্থেই পৃথিবীর আজকের মূল্যাব-

শেষ সঞ্চয়—সন্তোষকুমার দে। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-১২। পনেরো টাকা॥ **বিবাহ-মঙ্গল**—নির্মল হালদার। নাভানা। কলকাতা-১৩। আট টাকা॥ **স্বরাহত নিষাদ**—সংকলনগ্রন্থ। মহাপৃথিবী। হাওড়া-১। কুড়ি টাকা॥ **মুখরিত আত্মায়, একা**—অরুণ শীল। নাভানা। কলকাতা-১২। আট টাকা॥ **আরশি টাওয়ার**—সংকলনগ্রন্থ। সংবেদ। কলকাতা-১৭। কুড়ি টাকা॥ **দুধসর ধানক্ষেত**—মহবুব আলি। পত্রলেখা। কলকাতা-৯। দশ টাকা॥ **সাতজন একা**—সম্পাদনা—গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়। কোরক প্রকাশনী। চুঁচুড়া-৭১২১০১। সাত টাকা॥ **অগ্নি ও চীরবাস**—প্রভাতকুমার মিশ্র। ভোলানাথ প্রকাশনী। কলকাতা ৯। পাঁচ টাকা॥ **মহাকালের ঘোড়া**—প্রফুল্লকুমার সিংহ। অরণি। কলকাতা-৯। পঁয়ত্রিশ টাকা॥ **প্রাণ বসন্তসংকাশ**—শামসুল আলম সাঈদ। বই প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০। ষাট টাকা॥ **ধ্বংসস্তূপ**—অরুপরতন বসু। আভীগার্দ প্রেস। কলকাতা-২৯। সাতাশ টাকা॥ **হিটলারের লাশ**—বুলবুল সরওয়ার। চেতনা। কলকাতা-১৭। পনেরো টাকা॥

নমনের বিরুদ্ধে ধিক্কার তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ শ্রেণীতে চিহ্নিত করে। তাতে কিছু এসে যায় না যদি লেখাগুলি হয়ে উঠত বিশেষভাবে অনন্যসাধারণ। যদিও প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে, বিদ্রূপ ঘৃণা করবার অধিকার আছে একজন কবির, —সে অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেছেন জ্যোতির্ময়, কিন্তু দায়িত্ব-পালনে তিনি যেন একটু অমনোযোগী। কাব্যের এক দায় আছে। অথবা বলা যায়, জ্যোতির্ময় তা মানেন না, মানতে চান না। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

তুলনায় আলোক ভট্টাচার্য কবিতার বহিরঙ্গের বিষয়ে মনোযোগী হতে চেয়েছেন। ছন্দের ছ্যুতিকে তিনি কবিতায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তার মানে এই যে তিনি আগাগোড়া নিটোল ছন্দে কবিতা লিখে গেছেন; আমি ছন্দপ্রয়োগকেই কবির দায় বলতে চাইছি। আসলে এ এক প্রবণতা। শব্দব্যবহারে পূর্ব মুহূর্তেও কবির কল্পনারাজ্যে কি বাঙলা উচ্চারণের ধ্বনিশৃঙ্খলার নিয়মটি উঁকি দিয়েছিল—এই হল জানতে চাওয়া। আলোক তা কখনো মেনেছেন, কখনো মানেন নি। এই মানা না-মানায় কখনও কবিতার সর্বনাশ হয়, কখনও ছন্দের সর্বনাশ হয়। কবিতার সর্বনাশ হলে একমাত্র কবিরা দুঃখ পান, কিন্তু ছন্দের সর্বনাশ হলে কবিতার মাস্টারমশাইরা বেত হাতে ছুটে আসেন—এমনটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। আলোকের কবিতা পড়ে মনে হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎটি খুব দরিদ্র নয়। আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে "নাম" কবিতাটি।

অনেকদিন কবিতা লিখছেন অসীমকুমার বসু। তাঁর কবিতার সঙ্গে কবিতাপাঠকদের পরিচয়ও বেশ নিবিড়। তবু তিনি লিখেছেন : 'কবিকে সকলে চেনে না/কেউ কেউ চেনে।' অন্য কবিতায় লিখছেন—'এই ডালে রেখেছো তোমার হাত/পাতার শিহরণে গাছ তা টের পায়।' অসীমের কবিতা পড়ে আমরাও টের পাই—'তোমার হৃদয়ে জমে আছে প্রেম অপ্রেম, ম্লান অভিমান, ঝিলের জলে ছড়িয়ে পড়া হালকা কুয়াশা যেন মনে না পড়া কবিতা।' এক অলৌকিক দরজা দিয়ে পাঠক তাঁর কাব্যজগতে ঢুকে দেখতে পান নিউইয়র্ক ১৯৮৫ থেকে উড়িষ্যার জঙ্গল। কিন্তু ভ্রমণকারীকে বস্তু সংগ্রহ করতে নেই, নতুবা জিনিসের ভারে ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রেখে ঘরে ফিরে যেতে হয়।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় কাহিনীর আভাস থাকে। তাঁর কবিতার সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা নিয়ে হানা দিতে চায় গল্পের দেশ দখল করতে, অথবা উলটোটা। ফলে, লেখাগুলি পড়ার সময়ের উত্তেজনা পড়া শেষ হয়ে গেলে আর থাকে না। অথচ বিশ্বনাথ লিখতে পারেন—'লি পো তো প্রেমিক / হাঁটুজলে ডাকিনীর ছায়া' বা 'কোন গূঢ় অভিমানে / তুমি কালপুরুষকে ছুঁতে দিলে ঋতুভোরে / তোমার জরায়ুতে বিষপিঁপড়ের ডিম কেন?' বিশ্বনাম, আপনার কবিতার লাইন ছিনিয়ে নিয়ে আপনার কবিতাকেই বলছি—'সরলরেখায় তুমি এসো না, সুন্দরী।'

এই সঙ্কলনের সবচেয়ে রহস্যময়, ঋদ্ধ, উদাসীন ও কল্পনাপ্রবণ কবি হলেন শম্ভু রক্ষিত। তাঁর কবিতায় আমরা বিস্ময়করভাবে লক্ষ করে দেখেছি এক পারম্পর্যহীন গ্রন্থনা, চিন্তার স্ফটিক-বিচ্ছুরণ, যা হয়তো আলাদাভাবে নতুন আলোক সৃষ্টি করে না, কিন্তু এক অসহ্য ঘড়ঘড় শব্দে অস্থির করে তোলে। শম্ভু রক্ষিতের কবিতা অবশ্যই বাঙালি কবিতা-পাঠকদের অতীব কৌতূহলের এক পরীক্ষা-প্রার্থনীয় ক্ষেত্র। শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতাকে মানুষ গ্রহণ করবে, না ছুঁড়ে ফেলে দেবে—এ সংশয় যত বাড়ে ততই বোঝা যায় এক মৌলিক কাব্যভাষা আর চেতনার অধিকারী এই কবি কত নির্মমভাবে নিজেকে তাঁর কবিতার শরীরে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। অথচ বহু বাঙলা কাব্যসংগ্রহে শম্ভু বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। অদম্য আত্মশক্তিতে চালিত এই কবির প্রতিষ্ঠান-বিমুখতা, জীবনযাপন এবং স্বয়ম্ভরতা আগামী কবির জন্যে উদাহরণ হিসাবে কোথাও না কোথাও লিপিবদ্ধ

থাকছে।

ড. অরুণ শীল একজন কৃতী ছাত্র এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক। কিন্তু শুধু এতেই তিনি তৃপ্ত নন। পেশার আড়ালে নিজস্ব সাহিত্যসৃষ্টির বাসনাকে তিনি অবিরাম প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে রচিত ২১টি কবিতার সংকলন এটি। কিন্তু আমরা তাঁকে তত প্রশ্রয় দিতে পারছি না। যেমনটি নাভানার পল্লব মিত্র পেরেছেন। আধুনিক কবিতার প্রয়োগকৌশল অরুণবাবুর কবিতার অন্তরায় হওয়া সত্ত্বেও, তিনি গ্রন্থটি ছেপেছেন কবিতাগুলির সরাসরি সহজ বক্তব্য আছে বলে এবং লেখাগুলি ভারতীয়-তত্ত্বচেতনা-আশ্রিত বলে। তার কবিতায় একটা নম্র সুর আর স্পর্শকাতর মন সব সময়ই দেখা গেছে। কিন্তু এই কি যথেষ্ট?

"আরশি টাওয়ার" চারুজন কবির যৌথ কাব্যগ্রন্থ। সুধীর দত্ত লিখেছেন—'নির্মাণ ব্যতীত কোনো ইহকাল, পরকাল নেই। ধাপে ধাপে ঘুরে ওঠে সিঁড়ি—আরশি টাওয়ার। রেখে যাচ্ছি আনন্দভস্ম। তোমরা কেউ জানো না সেই মহাভিম্বের বিস্ফোরণ। তোমরা কেউই জানো না তাঁর পাঁচ আঙুলের মুদ্রা-বিন্যাস। পোড়া মাটির মানুষ/এক হাঁটু খরার মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছো/প্রত্নকালের ঘোড়া।' সুধীরের কবিতার জগৎ অনেক বিস্তৃত, তাই তাঁকে অনেক হাঁটতে হবে। তবে তাঁর সংযম, মৃদু কণ্ঠের উচ্চারণ প্রথম পদক্ষেপেই তাঁকে যতটা চিনিয়েছে তাতে আমাদের তাঁর প্রতি প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। আরশি টাওয়ারের মতো উঁচু সেই প্রত্যাশা। সুধীরকে তার মাথায় উঠতে হবে।

আপনি কবি, দুঃখ না ছুঁয়েই আপনি কবি হবেন, এমন হয় না। লিখেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কবিতায় দুঃখের বিসর্গবিন্দু বুদ্বুদের মতো ভেসে বেড়ায়। তিনি লেখেন—'আমি মাছ জলে থাকি / প্রায়শ কুণ্ঠের মত খুঁটে খাই নিজেরি আঙুল।' তবে এই সংকলনে তাঁর কবিতা সম্পর্কে পাঠককে অন্যতর নির্মাণের সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি। আঙ্গিকের চমকিত প্রয়োগে, বা বিষয়ের, কল্পনার ফোয়ারায় ভিজে যায় নি পাঠকের পোশাক। বরং বলতে পারি—আবেগকে আপনি একটু পরিত্যাগ করুন।

রবি গঙ্গোপাধ্যায় অনেকদিন কাব্যচর্চায় সঙ্গে যুক্ত। তিনি জানেন শব্দের নম্রতা। তাই লিখে রাখেন বিদায়। তিনি জানেন শব্দের মমতা। তাই লেখেন শান্তি। তিনি জানেন শব্দের ক্ষমতা। তাই বলেন সাবধান। তিনি জানেন শব্দের অভিশাপ। তাই স্পৃহাহীন ছায়াপথে-ছায়াপথে ছড়িয়ে দেন 'নিপাত যাক' ধ্বনি। তাঁর কাব্যময় পঙক্তির সুবাস যতই আমাদের ভালো লাগুক, বাঙলা কবিতার বিবর্তনের চিহ্ন কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না? প্রকরণের দিক থেকে না বদলালে তিনি আমাদের উৎসাহের আনন্দকে হারিয়ে ফেলবেন।

প্রচার আর প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এই সংকলনে ঈশ্বর ত্রিপাঠী সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কবি। ঈশ্বর লিখেছেন—'একজন কবির জন্য মহাবিশ্বে একটি শরীর /যা গান কিন্নরকণ্ঠে, স্বর্ণচাঁপা, শ্যামলিমা কাঁঠালপাতার /যা শৃঙ্খ, বীজকপ্প, শব্দে শব্দ বিরহিত ক্রৌঞ্চের স্বাক্ষর।' অথবা যখন লেখেন—'পায়ের গোড়ালি থেকে গুচ্ছ অশোকের মত স্তন', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন ঈশ্বরের কবিতা সুদূর বাঁকুড়া শহর থেকে পড়া হয় মুরশিদাবাদ, মেদিনীপুর কলকাতা, বর্ধমানে। এই বিস্ময়বোধ তাঁর সহজাত। আবার সেই কবিতাকেই তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন যখন পরবর্তী পঙক্তিতে অ্যানালিসিস করতে চেষ্টা করেন। আসলে এই নিঠুর নিয়তি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছি। ঈশ্বরও তার ব্যতিক্রম নন।

'মানুষ বুঝতে না পারে এমন কবিতা দাও,/বুঝি না

এ সম্পাদকের অহমিকা না আব্দার'—বলেছেন মহবুব আলী তাঁর "দুধসর ধানক্ষেত" কাব্যগ্রন্থে। সম্পাদকের অহমিকা বা আবদার মেটাতে তাই আদর্শ গোঁজামিলে ভরা ব্যাকরণী কবিতা দিতে তিনি রাজি হন নি। অতএব তাঁর আশা-নিরাশার কথা, ব্যর্থতা, পরাজয়, স্বপ্নকে সাদাসাপটা ভাষায় যথেচ্ছ লিখে গেছেন। শিক্ষিতদের বুজরুকি ধরতে গেলে যে শিক্ষিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই, এই শিক্ষাটুকু অন্তত তিনি অভিজ্ঞতা থেকে আগামী দিনে শিখবেন আশা করা যায়। নতুবা তাঁর সমস্ত চিৎকার অক্ষমের আস্ফালনের মতো শোনাবে।

"সাতজন একা"। সাতজন কবির যৌথ কাব্য-প্রয়াস। সম্পাদক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও এই সপ্তর্ষিদের একজন। সনৎ দে-র কবিতার নিরাভরণ বর্ণমালার জন্যে আকুতি। শীতল চৌধুরীর কাছে কবিতা সাধারণ মানুষের ছায়ামাত্র, যে ছায়া ইতিহাস-চেতনা, কালচেতনা ও সমাজচেতনার অবয়বে তৈরি। দীপক রায় এই সময়ের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। নিশিপাওয়া মানুষ কি জানে সে কোথায় যাবে? স্লো মোশানের কবিতার মতো তাঁর কবিতার চিত্রকল্প এ সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে। পিনাকী ঠাকুর বিশ্বাস করেন অবস্তুরও জগৎ রয়েছে। আলো-অন্ধকার নেই, পুণ্য নেই, পাপ নেই—আছে অহেতুক আনন্দ, বিস্ময়। আর পাতা পোড়ানোর রাত, মাংসহীন নরনারী, পোকা কানাই ঘোষ শুনতে পান—স্তব্ধতার ভিতরে ধ্বনি। কোথাও তুলির দাগ মোটা, কোথাও সরু। এই বিশ্বজগতের আলো-অন্ধকারের বিন্যাসটুকু বুঝে নিতে চান তিনি। মেঘে এত বিষণ্ণতা, জলে এত বিষণ্ণতা। কেন? গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় কবিতাকে খোঁজেন কখনো দৃঢ়মূল বাস্তবে-বিশ্বাসে, কখনো-বা ইতিময় রহস্যে,অবচেতনে। কবিতা তাঁর কাছে শব্দের কোনো চতুর তীরন্দাজি খেলা নয়। এই মুহূর্তের স্পন্দমান বস্তুজগৎ ও দ্বন্দ্বময় মানুষকে লক্ষ করে তাঁর নির্মাণ ও কবিতা। সংকলনের একমাত্র মহিলা কবি শান্তা চক্রবর্তী বিশ্বাস করেন অনুশীলনের দ্বারা একটি ভালো কবিতার জন্ম হয়। সমাজের দূষিত বাতাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তাঁর কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

প্রভাতকুমার মিশ্রের "অগ্নি ও চীরবাস"-কে কাব্যগ্রন্থ না বলে কাব্যপুস্তিকা বলাই যথাযথ হবে। বারো পৃষ্ঠায় মাত্র নটি কবিতা। অন্ধকারের পায়ে কি নুপুর নেই? যদি নেই, তবে গভীর অন্ধকারে সব জলবিন্দু একদিন নুপুরের মতো বেজে ওঠে কেন? প্রভাত আরও অপেক্ষার পর গ্রন্থ প্রকাশ করলে নিজের প্রতি সুবিচার করতেন। তাঁর অনুভব আর সঞ্চয়নের যে ছায়া এখানে রইল তা আরও লালন, যত্ন দাবি করে। তাড়াহুড়ো করে একটি বই কি না বের করলেই হত না।

কয়লাখনির পটভূমিকায় প্রফুল্লকুমার সিংহ "মহাকালের ঘোড়া" উপন্যাসটি লিখেছেন। সভ্যতার আদিশক্তি কয়লার তাপ। তাকে ঘিরে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও কর্মের উদ্যোগ নিয়ে এ উপন্যাস। বাঙলাদেশের এক অংশ জুড়ে একদিন যে কয়লা-খনিগুলি গড়ে উঠেছিল, তার সাহেবদের শাসন, শোষণ, ভোগবিলাসিতা, দান ও দর্শন এবং পাশা-পাশি এদেশী জমিদারদের অপদার্থতা, লোভ আর কাপুরুষতাকে লেখক এ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছিল না প্রযুক্তিগত কৌশলের প্রাচুর্য, চাবুকের সামনে পশুর মতো অসহায় মানুষকে দিয়ে আমাদের বিদেশী শাসকেরা শোষণ করার জন্য গড়ে তুলেছিল এই খনিগুলি। শুধু এদেশের ভূগর্ভের সম্পদ এবং শ্রমশক্তি নয়। বাঙলার শ্যামলী নারীদের তারা ইচ্ছামত ভোগ করে গেছে। কয়লাখনির অন্ধকার গর্ভে এমন কত কাহিনী হারিয়ে গেছে। অনেক চোখের জল আর অসম্মানের মূল্যে দেশের শিল্প-

বিকাশের যাঁরা সহায় হয়েছিলেন তাঁদের কথা কোথাও লেখা নেই। ইতিহাস—মহাকালের ঘোড়া—সবকিছু মাড়িয়ে ছুটে যায়। তার পায়ের নীচে কত প্রাণ, জনপদ শেষ হয়ে গেছে তার হিসাব নেবার ফুরসত নেই কারো।

উপন্যাসটির নাম বাঙলা সাহিত্যের এক প্রখ্যাত লেখকের একটি উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও দুটি উপন্যাসের বিষয় ভিন্ন, তবু লেখক এ নাম না রাখলে ভালো করতেন।

এ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করতে গিয়ে এবং শোষণ ও ক্রূরতার উদাহরণ দিতে-দিতে লেখক এক-একসময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। নরনারীর যৌন সম্পর্ক এবং যৌনতার অশ্লীল বিবরণ এই দীর্ঘ উপন্যাসটিকে ক্লান্তিকর এবং নীচু জাতের লেখার স্তরে নিয়ে গেছে। কোথাও-কোথাও বর্ণনা পর্নো-গ্রাফির বইকেও হার মানায়। একটি ধ্রুপদী উপন্যাসের সম্ভাবনাকে লেখক নিজ হাতে হত্যা করেছেন। এ লেখার যে দিকটি পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারত তা এড়িয়ে গিয়ে নারীর স্তন আর নিতম্বের কু-রুচিকর বর্ণনার মধ্যে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। কেন?

বাঙলাদেশের প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক শামসুল আলম সাঈদ "প্রাণ বসন্তসঙ্কাশ" উপন্যাসে মানব-মনের এক জটিল আলোছায়াকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে এটি এক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। লেখকের ভাষার গুণ এবং গল্প বলার ঢঙ পাঠককে শেষ পাতা অবধি টেনে নিয়ে যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক নারী। জয়নাব। সে শাশ্বত কালের মূল্যবোধে বিশ্বাসী বাঙলার এক সামান্য বধূ। বাল্যকালের প্রেমিককে ঘিরে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, সেটুকুই তার সম্পদ। হাজার কষ্ট, নির্যাতন, সুখেও তা সে হাতছাড়া করে নি। সে ছিল তার স্বপ্নের রাজপুত্র। তাকে সে রক্ত-মাংসের শরীরে কখনও চায় নি। তাই প্রথম স্বামীর কাছে শত অভাবের মধ্যেও তার মধ্যে শাশ্বত ঝরনার সঠিক সুর বজায় ছিল। বরং প্রভূত অর্থ আর ক্ষমতার মালিক হাজি সাহেব তার স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রায় জোর করে যখন তাকে দখল নিলেন, তখন সে প্রথম স্বামীর কথাই শুধু ভেবেছে। এরপর হাজি সাহেবের মনের পরিবর্তন আর তার মৃত্যুকে লেখক যেন রূপকের মাধ্যমে উপহার দিলেন। এখন সে হাজি সাহেবের অর্থ ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারিণী। এই অর্থ আর ক্ষমতা কেড়ে নিতে হাজির ছেলে আলি এগিয়ে এল। বালিকা জয়নাবের প্রথম প্রেমিককে আজ এতদিন জয়নাব দেখতে পেল। এপাশেও মৃত্যু, ওপাশেও মৃত্যু, মাঝে বহুদিন পরে দেখা-পাওয়া একজোড়া নর-নারী। কিন্তু আজ তাদের সম্পর্ক মাতা-পুত্রের। সম্পত্তির লোভে আলি এসেছে জয়নাবকে হত্যা করতে। বইটির শেষ পাতাটি যেন জয়নাবের কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে। আর একটু থেকে যাও আলি—আ—

অরূপরতন বসু হলেন সেই ধরনের লেখক, যাঁরা তাঁদের সমকালীন সাহিত্যচর্চা থেকে বাধ্যতামূলক দূরে বসে নির্মাণ করেন অন্য ধরনের সাহিত্য। তাঁদের আঙ্গিক, ভাষা, প্লট—সবই এত মৌলিক হয় যে পাঠককে প্রতি পরিচ্ছেদেই চমকে উঠতে হয়। এটা ভালো না মন্দ, সে আলোচনায় না গিয়ে এ কথা বলা যায়, কিছুটা পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলে পাঠকের পক্ষে এ ধরনের লেখার রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এঁরা সাহিত্যনির্মাণের পাশাপাশি পাঠক গড়ার কাজেও সমান নজর দিয়ে থাকেন। তাঁদের নিজস্ব পাঠকরা ক্রমশ এইসব সাহিত্যিকের ম্যানারিজম, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতে অভ্যস্ত হয়ে যান। যে-কোনো ভাষার সাহিত্যের জগতে এঁরা একটি সমান্তরাল ধারা। এবং এঁদের রচনার আলোচনা ছাড়া সেই ভাষার সাহিত্যের

আলোচনাও অসম্পূর্ণ। কারণ এমনটি বহুবার দেখা গেছে যে এঁদের প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া অনেক অপরিচিত ভঙ্গি ধীরে-ধীরে বহুজনমুখী সাহিত্যরচনাকারেরা পরবর্তী কালে গ্রহণ করেছেন। এইখানেই তাঁদের বিষয়।

অরূপরতন বসু এই ধারার একজন বিশিষ্ট গল্পকার হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু গ্রন্থাকারে সম্ভবত "ধ্বংসস্তূপ" তাঁর প্রথম বই। মোট ১১টি গল্প আছে বইটিতে।

গল্পগুলির নির্মাণকৌশল, এর অন্তর্গত রূপ, ব্যঞ্জনা, কাব্যময় উপমা ব্যবহার এবং বিষয় আমাদের প্রত্যাশাকেও অতিক্রম করে যায়। বুঝতে পারি—অরূপ হচ্ছেন সেই প্রতিভাবান লেখক যাঁর রচনা সময়ান্তরেও পাঠকের প্রয়োজন হবে। সম্ভবত তিনি এ কথা জানেন। তাই ১৯৬৭ সালের গল্পও এ গ্রন্থে রয়েছে। বাইশ বছরে ১১টি গল্প। সংযম এবং আত্ম-সংবরণের প্রতীক হয়ে রইল বইটি। কিন্তু ইদানীং একটি জিনিস আমাদের ক্লান্ত করছে তা—এই ধরনের গল্পগুলির নায়কদের চরিত্র যেন একটু প্রোটোটাইপ হয়ে উঠেছে। তারা বাধ্যত অলস, উপমা-দিয়ে ভাবতে ভালোবাসে, সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকে না, গতানুগতিক জীবন যাপনের প্রতি একটু বিদ্রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, যৌন অবসেশন ও ব্যর্থ লেখক-জীবন নিয়ে একই সঙ্গে হাহাকার ও রাজকীয় অবজ্ঞা যুগপৎ তাদের মনে ক্রিয়া করে। অরূপও এসবের আকর্ষণ কাটাতে পারেন নি। সম্ভবত আত্মজৈবনিক লেখার এ এক কুফল। বিশেষত লেখকেরা যদি বিশেষ এক শ্রেণী বা সমাজ থেকে উঠে আসেন। আশা করা যায়—অরূপ এই মোহ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবেন। সে শক্তি আর ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। আমার মতে এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প "শবসঙ্কট"। স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একটি নিউজকে তিনি যেভাবে গল্পে রূপান্তরিত করেছেন তাতে বোঝা যায় কী ক্ষমতার তিনি অধিকারী। বস্তুত বইটির প্রতিটি গল্পেই অরূপ তাঁর মননের, কাব্যময় হৃদয়ের এবং উদাসীনতার পরিচয় রেখেছেন।

বুলবুল সরওয়ারের "হিটলারের লাশ" গল্পগ্রন্থটিও পূর্ববর্তীর ধারায় লেখা। তবে লেখকের চিন্তার পারম্পার্য সর্বদা রক্ষিত হয় নি। মেধার ব্যবহারেও কিঞ্চিৎ শিথিল বলে মনে হয়েছে। যথেষ্ট যুক্তি ছাড়াই আমরা ব্যক্তিজীবনে যে ধরনের আচরণ করতে পারি, লেখক কিন্তু নিজের ইচ্ছামত তার সৃষ্ট চরিত্রকে দিয়ে তা বলাতে বা করাতে পারেন না। বরং চরিত্ররা লেখককে দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। বুলবুল সম্ভবত এ কথা বিশ্বাস করেন না। তাই কোনো যুক্তির তোয়াক্কা না করে তার গল্পের প্রেমিকা সাবরিনা প্রেমিক শওকতের মৃত্যু-প্রস্তাবে ভোট দেয়। এছাড়া অনেক অসংগতির কাঁটা বইটি পড়তে গিয়ে বারবার ফুটছে, সে তালিকা তুলে এ লেখা ভারি করে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু চমক আর গিমিকের আশ্রয়ে মাননমনের মত জটিল আর রহস্যময় স্থানে আশ্রয় পাওয়া যায় না, তা সম্ভবত লেখক জানেন। লেখক বরং যেখানে এসব কম করেছেন সে লেখাগুলির মধ্যে সোনালি ঝিলিক দেখা গেছে। যেমন 'সোনা ও এসিডের টুকরো কাহিনী' বা 'লাইট-পোস্ট'। আমার মতে এই দুটি গল্পই এ গ্রন্থে লেখকের মর্যাদা রক্ষা করেছে। গ্রন্থের শেষ মলাটে অগ্রজ সাহিত্যিকের মন্তব্য মুদ্রিত করার অনুমতি দিয়ে লেখক আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং প্রচারের প্রতি মোহকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

মুসলিম জনসংখ্যা কি বাড়ছে?

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

একটা কথা চলছে এখন সব জায়গায়—মুসলিমরা সংখ্যায় দ্রুত বাড়ছে। এই কথা থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মনে স্বাভাবিক কারণেই শঙ্কা জাগতে পারে—এভাবে বাড়তে-বাড়তে একদিন মুসলিমরা হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবে না তো। ভারতে মুসলিমরাই হয়তো হয়ে উঠবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই কথা থেকে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে না এসে পারে না, তা হল—মুসলিমরা কি সংখ্যায় বাড়ছে? কথাটা কি সত্যি?

উত্তর—হ্যাঁ, সত্যি। মুসলিমদের বৃদ্ধির হার, জন্মহার এবং মোট সংখ্যার আদমশুমারিজাত তথ্য ঘেঁটেও একথা যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা সত্যের অপলাপ করেন। সুতরাং মুসলিমরা যে সংখ্যায় বাড়ছে, এই সত্যকে মেনে নেওয়াই হবে সত্যনিষ্ঠ মননের পরিচয়।

এই সত্যকে স্বীকার করে যে-যে প্রশ্নগুলো আবার আমাদের মনের দরজায় কড়া নাড়ে, সেগুলো হল: মুসলিমদের এই সংখ্যাবৃদ্ধির ধরনটা কেমন? ঠিক কতটা বাড়ছে তারা? পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীগুলোর কি সংখ্যা হ্রাস হচ্ছে? সত্যিই কি মুসলিমরা বাড়তে-বাড়তে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারে? আর তাদের বৃদ্ধির কারণ রূপে কি 'তাদের বহুবিবাহ এবং বহুবিবাহজাত অগুনতি সন্তানসংখ্যাকে' চিহ্নিত করব?

এইসব প্রশ্নাবলীর মধ্যেই নিহিত আছে 'বিপন্ন হিন্দু' জনমতের উত্তর। আমাদের কাজ সত্যাশ্রয়ী হয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা। তথ্য এবং যুক্তির সাহায্যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করলে, যে কথাটা চলছে, তার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যাবে। তখন আর কোনোরকম কথা-চালাচালি আমাদের 'অন্ধ বিমূঢ়তা'র দিকে ঠেলে দিতে পারবে না।

এখানে আমরা প্রধানত দুটি ধারণাকে যুক্তি-বুদ্ধি এবং তথ্যের আলোকে বিচার করব। তার একটি হল 'মুসলিম জনবিস্ফোরণ' এবং অন্যটি হল মুসলিমদের 'বহুবিবাহ এবং বহুবিবাহজাত অগুনতি সন্তান'।

আশা করব, সাধারণ মানুষ তাঁদের বোধে-মননে ক্রমেই যুক্তিমনস্ক এবং বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। যেসব মানুষজন অন্ধ-বিমূঢ়তার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধির, সত্যবুদ্ধির উন্মেষ ঘটাতে সতত সচেষ্ট, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে এই বিচারে প্রবৃত্ত হবেন। এ আশা আমাদের আরো বেশি সংহত হতে প্রত্যয় যোগাবে।

ভারতের মুসলমান

ইসলামের সঙ্গে ভারতের পরিচিতি সপ্তম শতাব্দীতে। তার পর থেকে প্রায় তেরোশো বছর ধরে এদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব। বাইরে থেকে যাঁরা এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের একটা বড়ো অংশই আর নিজেদের দেশে ফিরে যান নি। ভারতেই তাঁরা স্থায়িভাবে বসবাস করে আসছেন।

বাইরে থেকে ভারতে প্রথম এসেছিলেন আরব ব্যবসায়ীরা। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলে। একাদশ শতাব্দীতে পানজাবে আধিপত্য বিস্তার করলেন তুর্কিরা। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিতে সুলতান-রাজ কায়েম হল। ১৩৫০ সালের ভেতর তা ছড়িয়ে পড়ল সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত। চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতান-রাজের ভাঙন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘল সাম্রাজ্যের উদয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার বিলয়।

এই বিশাল সময় জুড়ে ভারতে এসেছেন মুসলিম ব্যবসায়ী, দেশ-দখলকারী সেনানায়ক। সঙ্গে তাঁদের সেনাবৃন্দ, অনুচর। অনেক বিজয়ী শাসক দেশে ফিরে গেলেও ভারতে রেখে গেছেন তাঁদের প্রতিনিধি-প্রশাসক এবং সেনাদের। আরব, তুর্ক, পারস্য, আফগানিস্তান থেকে আসা এই অভিবাসী মুসলিমরা আজো নিজেদের সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান বলে পরিচয় দেন। সংখ্যায় সঠিক কত মুসলিম এভাবে ভারতে এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন, তার প্রামাণ্য তথ্যের অভাব থাকলেও বলা যায়—আজকের ভারতের মুসলিমদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই অভিবাসী মুসলিমদের উত্তরপুরুষ।

কিন্তু অভিবাসী মুসলিম সংখ্যায় যতই আসুন না কেন, ভারতের মতো বিশাল দেশে তাঁরা সব সময়েই এক অতিক্ষুদ্র গোষ্ঠী। সেজন্যে তাঁদের বংশবৃদ্ধির হারে যদি কোনো লাগাম না-ও থাকে, তবুও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সংখ্যায় এতটা বেড়ে ওঠার। বলতে চাইছি—যে হারে ভারতের মুসলমান সংখ্যায় বেড়েছে, সেই হারে ওই অতিক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না মোটেই। তাহলে এই বাড়তি মুসলিমরা এল কোথা থেকে? উত্তর—ভারতেরই অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে। একটা বিষয়ে সব ঐতিহাসিকরা একমত: আজকের ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বড়ো শরিক ধর্মান্তরিত মুসলিমদের বংশধররা। কেন বা কীভাবে অন্য ধর্মের মানুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়ে আবার ঐতিহাসিকদের নানা মত। কেউ-কেউ বলেন—মুসলিম শাসকগণ গায়ের জোরে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। আবার অনেকের মত —না, হিন্দু সমাজে যে জাতপাতের বিচার, তাতে নীচু-জাতের মানুষের কোনো সামাজিক অধিকার না-থাকাতে তাঁরা ইসলামের সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম বদল করেছিলেন। কোন্ মতটি ঠিক, তার বিচার আমাদের এই আলোচনার বিষয় নয়। তবে একটা কথা বোধ হয় বলা যায়—ভারতে মুসলিম প্রশাসকরা ছিলেন এক নগণ্য গোষ্ঠী। তাঁদের ওই ছোট্টো সেনা-বাহিনী দিয়ে ভারতের মতো এক বিশাল দেশে কি তাঁরা বছরের পর বছর রাজত্ব চালাতে পারতেন?—যদি না ব্যাপক হিন্দুরা তাঁদের সহযোগিতা করতেন? আর জোর করে দলে-দলে হিন্দুদের মুসলিম করলে কি এই সহযোগিতা মিলত? এই বিষয়ে বিবেকানন্দর অভিমত খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন:

The Mohammedan conquest of India came as a salvation to the downtrodden, to the poor. That is why one-fifth of our people have become Mohammedans. It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think that it was all the work of sword and fire. It was to gain their liberty from the...zaminders and from the...priest, and as a consequence you find in Bengal there are more Mohammedans than Hindus amongst the cultivators, because there were so many zaminders there.*

['ভারতে মুসলিম বিজয় নির্যাতিত, গরিব মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। সেজন্যেই এদেশের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলিম হয়ে গেছিল। এসব শুধু অস্ত্রের জোরে হয় নি। অস্ত্রের জোরে আর ধ্বংস করে (sword and fire) এ কাজ (হিন্দুদের মুসলিমে রূপান্তর) হয়েছিল—এমন চিন্তা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তারা (গরিব মানুষ) জমিদারদের, পুরোহিতদের কবল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। এজন্যেই বাঙলার চাষীদের (কৃষিজীবী) মধ্যে দেখা যায় হিন্দুদের থেকে মুসলিম বেশি। কারণ বাঙলায় ছিল অনেক-অনেক জমিদার।']

যাই হোক না কেন, সেদিনের ধর্মান্তরিত মুসলিমরাই যে আজকের ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবথেকে বড়ো ভাগের পূর্বপুরুষ, এই ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তাহলে বলা যায়—ধর্মান্তরিত মুসলিম, অভিবাসী মুসলিম এবং তাঁদের বংশধরেরাই আজ ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী।

১০০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ভারতের মোট জনসংখ্যা এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটা তুলনামূলক ছবি আমরা টেবল ১-এ দেখব। যদিও ছবিটি অসম্পূর্ণ, কেননা অনেক তথ্যই পাওয়া যায় নি।

টেবল—১

বছর (খ্রী)	ভারতের মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতাংশে
১০০০	২০০,০০০,০০০	—	—
১১০০	১৮০,০০০,০০০	*	*
১২০০	১৯০,০০০,০০০	৩০,০০,০০০	১·৬—২·১
		৪০,০০,০০০	
১৩০০	১৭৫,০০০,০০০	*	*
১৪০০	১৭০,০০০,০০০	৩,২০০,০০০	১·৮
১৫০০	১২৫,০০০,০০০	*	*
১৬০০	১৪০,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০	৯·৮৫
১৭০০	১৭৫,০০০,০০০	*	*
১৮০০	১৭০,০০০,০০০	২৫,০০০,০০০	১৪·০০
১৮৮১	*	৪৯,৯৫৩,০০০	১৯·০০

* তথ্য নেই।

Lal K. S.: *Growth of Muslim Population in Mediaval India (A. D. 1000-1800)*, Delhi: 1973.

টেবল ১ থেকে দেখছি—ভারতে মুসলিমরা আসার পর থেকে প্রায় এগারোশো বছর ধরে তারা মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশে পৌঁছেছে। আর-একটা দিক দেখা যাচ্ছে—১১০০-১৪০০ সালে যেখানে মোট জনসংখ্যা ১৭-১৮ কোটি, সেখানে মুসলিম মাত্র ৩০-৪০ লক্ষ। ১৬০০ সালে এসে মুসলিম জনসংখ্যা ১·৫ কোটিতে পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যান থেকেও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, হঠাৎ এভাবে মুসলিমদের সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার কারণ আর অন্য কিছু নয়—হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়া।

* Selected Works of Swami Vivekananda, Vol. 3. 12th Ed. 1979. p 294 and Vol. 8. 6th Ed. 1977, Extracted from the saying of Swami Vivekananda compiled in "Proletariat | Win Equal Rights" Advaita Ashrama, Calcutta, 1984, p 16.

Quoted in 'The Problem of Hindu Muslim Conflicts'—S.R. Bhatt, Navakarnataka, p 30.

এবার দেখা যাক ১৮৮১ সালের পর থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে।

'২০০০ সালের ভেতর মুসলিমরা সংখ্যায় হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবে!'

এই কথাটাই এখন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে—কীভাবে ২০০০ সালের মধ্যেই মুসলিমরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-প্রদত্ত তথ্য :

টেবল—২

সন	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতাংশে
১৯৫১	৩৬.১ কোটি	৩.৫ কোটি	৯.৮
১৯৬১	৪৩.৪ "	৪.৭ "	১০.৮
১৯৭১	৫৪.৮ "	৬.১ "	১১.২
১৯৮১	৬৫ "	৮.৫ "	১৩.২

[*'Communalism—Its Causes and Consequences'* p 51—সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ—অমিতাভ চন্দ্র, সোসাইটি অ্যাণ্ড চেন্জ, পৃ ২০ থেকে গৃহীত।]

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেওয়া এই তথ্যের সঙ্গে সরকারি আদমসুমারি বা জনগণনা থেকে পাওয়া তথ্যের যথেষ্ট গরমিল আছে। তবুও আমরা পরে ওদের দেওয়া তথ্যকেই বিশ্লেষণ করব। দেখব, ওদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কিভাবে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে।

কিন্তু এই যে প্রচার—মুসলিমরা দ্রুত বাড়ছে সংখ্যায়, জনবিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে ওদের—সেটা যে বেশ জোর পেয়ে গেছে সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই কোনো। একটু বস্তুনিষ্ঠ হয়ে এবং তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা যাক—বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই প্রচারের ভেতর সারবস্তু কতটা।

১৯৫১ সালের আগে ধর্মসম্প্রদায়গুলোকে আলাদা করে জেলাওয়ারি কোনো সরকারি জনগণনা হয় নি। ১৯৫১ সালেই প্রথম জেলাওয়ারি এই চেষ্টা নেওয়া হয়। এবং ১৯৬১-র আদমশুমারিতে ধর্মসম্প্রদায়গুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির হার ইত্যাদি দিকগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। ভারতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান—এই ছটি ধর্মের মানুষকে প্রধান ধর্মসম্প্রদায়রূপে এবং বাকিদের 'অন্যান্য ধর্মভুক্ত' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক সীমানায় এই ধর্মসম্প্রদায়গুলোর অবস্থান (মোট জনসংখ্যার শতাংশ অনুপাতে) আমরা ১৯২১ থেকে দেখব পরপৃষ্ঠায় টেবল ৩-এ।

এর সঙ্গে ১৯৮১-র জনগণনা ধরলে পাওয়া যায়—

ধর্ম-সম্প্রদায়	মোট জনসংখ্যার শতাংশে	শতাংশের পরিবর্তন (১৯২১ - ১৯৮১ = ৬০ বছরে)
হিন্দু	৮২ ৬৪	−১ ৭৬
মুসলিম	১১.৩৫	+১.৭৮
খ্রীষ্টান	২'৪৩	+১.৬৪
শিখ	১.৯৬	+১'৫৯
বৌদ্ধ	০'৭১	+০.৬৬
জৈন	০.৪৮	−০.০৩

[*Census of India* : 1981, Series 1, Paper 3 of 1984.]

টেবল-৩ থেকে আমাদের নজরে আসবে—১৯২১-৭১, এই পঞ্চাশ বছরে প্রধান-প্রধান ধর্মসম্প্রদায়গুলোর শতাংশ হ্রাস-বৃদ্ধিতে খুব একটা বড়ো রকমের কোনো ওলটপালট হয় নি। পরের দশ বছরেও (১৯৮১ পর্যন্ত) হেরফের উনিশ-বিশ। এই পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরেই হিন্দুরা আছেন মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের কিছু ওপরে। আর মুসলিমরা ৯-১১

টেবল—৩

ধর্মসম্প্রদায়	মোট জনসংখ্যার শতাংশে (ক) ১৯২১	(ক) ১৯৩১	(খ) ১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	শতাংশের পরিবর্তন (১৯২১-৭১ = ৫০ বছর)
হিন্দু	৮৪'৪০	৮৪'৩৪	×	৮৪'৯৮	৮৩'৫১	৮২'৭২	−১'৬৮
মুসলিম	৯'৫৭	৯'৮৬	×	৯'৯১	১০'৭০	১১'২১	+১'৬৪
খ্রীষ্টান	১'৭৯	২'১১	×	২'৩৫	২'৪৪	২'৬০	+০'৮১
শিখ	০'৩৭	০'৪৬	×	১'৭৪	১'৭৯	১'৮৯	+১'৫২
বৌদ্ধ	০'০৫	০'০৪	×	০'০৫	০'৭৩	০'৭০	+০'৬৫
জৈন	০'৫১	০'৫০	×	০'৪৫	০'৪৬	০'৪৭	−০'০৪
অন্যান্য	৩'৩১	২'৬৯	×	০'৫২	০'৩৪	০'৪০	
ধর্ম বলা নেই					০'০৩	০'০১	

ক—১৯২১ এবং ১৯৩১-এর পরিসংখ্যানে আসাম, পশ্চিমবাঙলা এবং পানজাবের ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় নি। কারণ ১৯৪৭-এর ভারতবিভাজন। সমস্ত পরিসংখ্যান বর্তমান ভারতের। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

খ—১৯৪১-এর পরিসংখ্যান বাদ দেওয়া হয়েছে কেননা এই তথ্যই পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত রচনা করেছিল।

[সূত্র : 1. *The Gazetteer of India*, Vol. I, Country and People.
2. *The Census Commission of India*—Various Publications.
Population Geography of Muslims of India—Nafis Ahmad Siddiqui—S. Chand & Co., New Delhi, পৃ 16 থেকে গৃহীত।]

শতাংশে। ১৯৭১ পর্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধি কমবেশি ১'৬ শতাংশ। ১৯৮১-তে তা ১'৭ শতাংশ।

এ-থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্ন আসে যে, পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যদি ধর্মসম্প্রদায়গুলোর মোট জনসংখ্যার শতাংশ অনুপাত প্রায় একইরকম (হেরফের উনিশ-বিশ) থাকে তবে কীভাবে, কোন্ কায়দায় আগামী দশ বছরের মধ্যে এই হ্রাসবৃদ্ধির হারের একেবারে আমূল বদলে যাওয়া সম্ভব? যার ফলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে! তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে কি এমন অদ্ভুত কথার ব্যাখ্যা মেলে?

১৮৮১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত অখণ্ড ভারতের মোট জনসংখ্যা এবং মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কেমন? বিভাজনের পর বর্তমান ভারতের চিত্রটাই বা কী?

টেবল-৪ থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—১৮৮১-১৯৪১ : এই ৬০ বছরে মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার ১৯'৭৪ শতাংশ থেকে ২৩'৮১ শতাংশে (জে. এম. দত্ত অনুযায়ী) বা ১৯'৯৭ শতাংশ থেকে ২৪'২৮ শতাংশে (কিংসলে ডেভিস অনুযায়ী) পৌঁছেছে। অর্থাৎ ৬০ বছরে বৃদ্ধি মাত্র ৪'০৭ বা ৪'৩১ শতাংশ।

এই টেবল থেকেই আর-একটা বিষয় লক্ষ করা যাচ্ছে—মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের তুলনায় মুসলিমদের বৃদ্ধির হার একটু বেশি। এটা নিয়েই বেশি চেঁচামেচি হয়। কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কেন একটু বেশি, এবং এর ফলে মোট জনসংখ্যায় কী ধরনের হেরফের ঘটে, সেটা আমরা একটু পরেই

টেবল—৪

সাল	মোট জনসংখ্যা	দশ বছরে শতাংশ হ্রাসবৃদ্ধি	মুসলিম জনসংখ্যা	দশ বছরে শতাংশ হ্রাসবৃদ্ধি	মোট জনসংখ্যার শতাংশে মুসলিম জনসংখ্যা	
					জে. এম. দত্ত	কিংসলে ডেভিস্
১৮৮১	—	—	৪৯,৯৫৩,০০০	—	১৯'৭৪	১৯'৯৭
১৮৯১	—	—	৫৭,৬৬৮,০০০	+১৪'২৪	১৯'২৬	২০'৪১
১৯০১	২৩৬,২৮১,২৪৫	—	৬২,১১৯,০০০	+ ৮'৮৫	২১'২২	২১'৮৮
১৯১১	২৫২,১২২,৪১০	+০৬'৭৩	৬৭,৮০৫,০০০	+ ৯'২০	২১'২৬	২২'৩৯
১৯২১	২৫১,৩৫২,২৬১	−০০'১	৭১,৩০০,০০০	+ ৪'০৬	২১'৭৪	২৩'২৩
১৯৩১	২৭৯,০১৫,৬৯৮	+১১'০১	৭৯,৩০৬,০০০	+১১'৬৯	২২'১৬	২৩'৪৯
১৯৪১	৩১৮,৭০২,০১২	+১৪'২২	৯৪,৪৪৭,০০০	+১৯'০০	২৩'৮১	২৪'২৮

টেবল—৫

সাল	মোট জনসংখ্যা	দশ বছরে শতাংশ হ্রাসবৃদ্ধি	মুসলিম জনসংখ্যা	দশ বছরে শতাংশ হ্রাসবৃদ্ধি	মোট জনসংখ্যার শতাংশে মুসলিম জনসংখ্যা
১৯৫১	৩৬১,১২৯,৬২২	+১৩'৩১	৩৫,৪১৪,২৮৪	—	৯'৯১
১৯৬১	৪৩৯,২৩৫,৬৮২	+২১'৫০	৪৬,৯৩১,৩৫৭	+২৫'৪৬	১০'৬৯
১৯৭১	৫৪৭,৯৪৯,৮০৯	+২৪'৬৬	৬১,৪১৭,৯৩৪	+৩০'৮৫	১১'২১

[*Population Geography of Muslims of India*—Nafis Ahmad Siddiqui : S: Chand & Co. New Delhi, p. 38]

দেখব। তার আগে নজর করা দরকার—অখণ্ড ভারতে (১৯৪১) মুসলিমরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ২৩'৮১ বা ২৪'২৮ শতাংশ। ১৯৫১-তে দ্বিখণ্ডিত ভারতে তা নেমে আসে ৯'৯১ শতাংশে। বুঝতে অসুবিধে হয় না—মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই পড়ে যায় তৎকালীন পাকিস্তানে অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে।

১৯৫১-পরবর্তী ২০ বছরে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধি মাত্র ১'৩ শতাংশ। ১৯৮১ পর্যন্ত হিসাব নিলে ৩০ বছরে বৃদ্ধি ১'৪৪ শতাংশ (টেবল-৬ দেখুন)। এখানে মনে রাখা দরকার : এই একই সময়ে হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন হয় নি যে হিন্দুদের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার হার ভয়ানক কমে গেছে। আর সেজন্যেই হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে ইতর-বিশেষ হয় নি তেমন।

১৯৮১-র আদমসুমারিতে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা এবং তাদের বৃদ্ধির হার।

টেবল—৬

ধর্ম সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতাংশে	দশ বছরে হ্রাসবৃদ্ধির হার
হিন্দু	৫৪৯,৭২৪,৭১৭	৮২'৬৪	+২৪'১৫
মুসলিম	৭৫,৫৭১,৫১৪	১১'৩৫	+৩০'৫৯
খ্রীষ্টান	১৬,১৭৪,৪২৮	২'৪৩	+১৬'৭৭
শিখ	১৩,০৭৮,১৪৬	১'৯৬	+২৬'১৫
বৌদ্ধ	৪,৭১৯,৯০০	০'৭১	+২২'৫২
জৈন	৩,১৯২,৫৭২	০'৪৮	+২৩'৬৯

[*Census of India : 1981*, Series 1, Paper 3 of 1984 'Household Population by Religion of Head of Household']

টেবল-৬ থেকে দেখছি হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার ৮২'৬৪ শতাংশ এবং মুসলিমরা ১১'৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ থেকে কিছু বেশি। হিন্দুরা যেখানে প্রায় ৫৫ কোটি ; মুসলিমরা সেখানে প্রায় ৭'৫ কোটি।

আর-একটা টেবল থেকে আমরা ১৯৫১-৬১ এবং ১৯৬১-৭১-এর দশকগুলোতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা, তাদের বৃদ্ধির হার ইত্যাদির ওপর একবার চোখ বোলাই।

টেবল—৭

ধর্ম সম্প্রদায়	১৯৭১-এ জনসংখ্যা	১৯৫১-৬১=১০ বছরে হ্রাসবৃদ্ধি	১৯৬১-৭১=১০ বছরে হ্রাসবৃদ্ধি
হিন্দু	৪৫৩,২৯২,০৮৬	+২০'২৯	+২৩'৬৯
মুসলিম	৬১,৪১৭,৯৩৪	+২৫'৪৪	+৩০'৮৫
খ্রীষ্টান	১৪,২২৩,৩৮২	+২৭'৩৮	+৩২'৬০
শিখ	১০,৩৭৮,৭৯৭	+২৫'১৩	+৩২'২৮
বৌদ্ধ	৩,৮১২,৩২৫	+১,৬৭০'৭১	+১'৭২১
জৈন	২,৬০৪,৬৪৬	+২৫'১৭	+২৮'৪৮

[*Population Geography of Muslims of India*, Page-3]

পরিসংখ্যানের ধাঁধা

বৃদ্ধির হার মুসলিমদের বেশি। টেবল-৬-এ দেখা যাচ্ছে শিখদেরও বৃদ্ধির হার হিন্দুদের থেকে বেশি। আবার টেবল-৭ থেকে দেখছি ১৯৫১-৬১=১০ বছরে সব ধর্মসম্প্রদায়ের বৃদ্ধির হার হিন্দুদের থেকে বেশি। ১৯৬১ ৭১-এ কেবল বৌদ্ধদের বৃদ্ধির হার হিন্দুদের থেকে একটু কম। ১৯৫১-৭১ সালে যেখানে সব সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির হার ২০ থেকে ২৭-এর মধ্যে সেখানে বৌদ্ধদের বৃদ্ধির হার আবার ১,৬৭০'৭১। ১৯৮১-র তথ্য অনুযায়ী হিন্দুদের বৃদ্ধির হার যেখানে ২৪'১৫, মুসলিমদের তা ৩০'৫৯। 'এই হারে যদি বাড়তে থাকে মুসলিমরা তাহলে তো শিরে সংক্রান্তি! সত্যিই তো ওরা যে-কোনো দিন ছাপিয়ে যেতে পারে হিন্দুদের!'

একটা তুলনা নেওয়া যাক। 'ক' ব্যবসায়ী বছর-শেষে ১০০ শতাংশ লাভ করেন আর 'খ' করেন ৫ শতাংশ। অমনি আমরা ধরে নেব 'ক' দারুন লাভ করছেন। কিন্তু এই তথ্যে যা বলা নেই তা হল কে কত টাকা খাটিয়েছেন। যদি বলি, 'ক'-এর মূলধন ২৫,০০০ টাকা এবং 'খ'-এর ১০ লাখ টাকা, তাহলে 'ক'-এর প্রকৃত লাভ ২৫,০০০ টাকা আর 'খ'-এর ৫০,০০০ টাকা। অর্থাৎ খ মাত্র ৫ শতাংশ লাভ করলেও তার লাভের পরিমাণ 'ক'-এর দ্বিগুণ (যে 'ক' ১০০ শতাংশ লাভ করেছে!)।

উপরের উদাহরণে একটা বিষয়ে স্পষ্ট হচ্ছে : ছোটো রাশির সামান্যতম পরিবর্তনে শতাংশ হারে বিরাট পরিবর্তন। আবার বড়ো রাশির ভালো রকম পরিবর্তনেও শতাংশ হারে তেমন কোনো রদবদল ঘটে না। সুতরাং শতাংশ-বৃদ্ধির হার দিয়ে প্রকৃত জনসংখ্যার অনুপাত বিচার করলে তা জনসংখ্যার আসল ছবিটিকে ঢেকে রাখে।

টেবল—৭-এ দেখছি ১৯৫১-৬১ সালে বৌদ্ধদের বৃদ্ধির হার ১,৬৭০'৭১ ; অন্যদের যেখানে ২০ থেকে ২৭। এরকম তথ্য হাজির করলে মাথা ঘুরে যায় বই কি। ওই হারে বেড়েও ১৯৭১-এ বৌদ্ধরা সংখ্যায় কত? ৪০ লক্ষের কিছু কম। যেখানে হিন্দুরা ৪৫ কোটির কিছু বেশি। কিন্তু বৃদ্ধির হার এমন অস্বাভাবিক কেন? কারণ তিব্বত থেকে দলাই লামা যখন ভারতে আশ্রয় নেন তখন বহুসংখ্যক তিব্বতীও তাঁর সঙ্গে ভারতে আশ্রয় নেন। তাঁরা সব বৌদ্ধ। এর আগে গণণা বৌদ্ধদের সংখ্যার ওপর এক উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যায় বৌদ্ধ এদেশে আসাতে বৃদ্ধির-হারে এই ভেলকিবাজি। যা কিনা মোট জনসখ্যার অনুপাতকে তেমন কিছু একটা প্রভাবিত করতে পারে না। '৫১-৬১ সালে ১'৫ হাজারের ওপর বৃদ্ধির হার হয়েও বৌদ্ধরা '৮১-তে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০'৭১ শতাংশ ; হিন্দুরা যেখানে ৮২'৬৪ শতাংশ। (টেবল-৬ দেখুন)।

সিকিমে ১৯৭১-৮১ = ১০ বছরে মুসলিমদের বৃদ্ধির হার ৮৬৭'৪৬। যা মুসলিমদের গড় বৃদ্ধির হার ৩০'৫৯ থেকে অনেক বেশি। আসলে ১৯৭১-এ সিকিমে মুসলিম ছিল ৩৩৫ জন। ১৯৮১-তে তা বেড়ে হয়েছে ৩,২৪১ জন। এবং ওই হারে বেড়েও সিকিমে মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১'০৩ শতাংশ। নাগাল্যান্ডেও মুসলিমদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি : ২২৮'০৪। অর্থাৎ ৭১ সালে ছিল ২,৯৬৬ জন মুসলিম। ৮১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১১,৮০৬-এ। এই হারে বেড়েও নাগাল্যান্ডে মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার ১'৫২ শতাংশ মাত্র।

মুসলিমদের জনসংখ্যার জেলাওয়ারি তথ্য ঘাঁটলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৬১-৭১ দশকে মুসলিমদের গড় বৃদ্ধির হার ৩০'৮৫। সমীক্ষায় দেখা গেছে—যে ৩৫৬টি জেলায় মুসলিমদের বসবাস তার মধ্যে ১৯৭টি জেলায় বৃদ্ধির হার গড় বৃদ্ধির হার থেকে বেশি। ১৩৯-টি জেলার বৃদ্ধির হার গড় বৃদ্ধির হারের কম বা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৫টি জেলায় মুসলমানরা হ্রাস পেয়েছে। ৫টি জেলার তথ্য পাওয়া যায় নি। জেলাওয়ারি এই গণনায় লক্ষ করা গেছে : যেখানে-যেখানে মুসলিম বসতি প্রায় ছিলই না বা থাকলেও খুব নগণ্য, সেসব জেলায় বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক। আর যেসব জেলায় মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে বৃদ্ধির হার গড় বৃদ্ধির হার থেকে কম। এবং বহু জায়গায় বাস্তবে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা কমে গেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় সংখ্যা-গরিষ্ঠের (হিন্দু বা মুসলিম) হ্রাসবৃদ্ধির হারে খুব একটা তারতম্য হয় না। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকের সামান্য পরিবর্তনও বৃদ্ধির হারকে অস্বাভাবিক দেখায়। যে ৪৯টি জেলায় মুসলিমদের বৃদ্ধির হার খুব বেশি, তার চিত্রটা দেখা যাক।

টেবল-৮ থেকে দেখা যাচ্ছে—হিমাচল প্রদেশের কিনৌর জেলায় বৃদ্ধির হার অসীম। বাস্তবে, ১৯৬১ সালে সেখানে মুসলিম জনবসতি ছিলই না। ৭১-এ

টেবল—৮

জেলা	সমগ্র জেলার বৃদ্ধির হার ১৯৬১-৭১ শতাংশ পরিবর্তন	জনগণের অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিমদের প্রকৃত জনসংখ্যা
কিনৌর	অসীম	০'০৬	২৮
মণিপুর উত্তর	২,৭৭৬'৯২	০'৩৬	৩৭৪
মণিপুর পশ্চিম	১,৭০০'০০	০'০৮	৩৫
মোকচাঙ	১,১২০'৭৫	০'৩৮	৬৪৭
মিজোরাম	৮৩৭'০৯	০'৫৭	১,৮৮২
বৌদ্ধ-খোদ্দমলস	২১৯'৯৬	০'২৩	১,৪২৭
কোহিমা	১৭৭'৬৬	১'০৭	১,৮৭৭
তুয়েংসাঙ	১৭২'৮৪	০'২৬	৪৪২
কেওঝর	১৬৮'৭৪	০'৭৩	৬,২২৮
চণ্ডীগড়	১৫৩'৫৮	১'৪৫	৩,৭২০
উত্তর কাশী	১৩৭'৬০	০'৩৯	৫৭৫
মহেন্দ্রগড়	১৩৬'২০	০'৪৯	৩,৩৮০
মণিপুর পূর্ব	১৩০'৭৭	০'০৫	৩০
গোয়া	১৩০'০৬	৩'৩৩	২৬,৪৮০
সুন্দরগড়	১১৪'৩১	২'১৯	২২,৫৬৭
দমন	১০৯'০৮	১১'২৪	৪,৩৫৩
সম্বলপুর	১০৭'৪৮	০'৬৯	১২,৬৯৬
হিসার	৯৬'০৭	০'৫৭	১২,২১১
কার্নাল	৯৪'৩৯	১'৩৯	২৭,৫২৩
ফিরোজপুর	৮৮'৮০	০'৩৩	৬,৩৪০
কোরাপুট	৮৮'৬৫	০'৩৪	৬,৯২৯
গাড়োয়াল	৮৩'০৮	১'৬১	৯,৯০৭
সিমলা	৭৯'১৯	২'০০	৪,৩৪৯
চিঙ্গলপুট	৭১'০৭	২'৮৬	৮৩,০৯০
থানে	৭০'৯৫	৬'৩১	১৪৩,৯৫৮
দিল্লী	৬৯'২০	৬'৪৭	২৬৩,০১৯
পিথোরগড়	৬৮'১৮	০'৩৮	১,২০৪
মাণ্ডি	৬৭'৬৭	০'৬১	৩,১৩২
দেওরিয়া	৬৭'০৪	১৬'১৭	৪৫৪,৬৬৫
দাদরা-নগর হাভেলি	৬৭'০৪	১'০০	৭৪০

জেলা	সমগ্র জেলার বৃদ্ধির হার ১৯৬১-৭১ শতাংশ পরিবর্তন	জনগণের অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলিমদের প্রকৃত জনসংখ্যা
মিকির পার্বত্য	৬২'৮৯	১'৩০	৪,৯২৯
মাদ্রাজ	৬২'২৭	৮'৫১	২১০,৮৩
বাস্তার	৫৭'৯৫	০'৪৯	৭,৪৬৮
আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৫৭'৫৪	১০'১২	১১,৬৬৫
বৃহত্তর বোম্বাই	৫৬'৬৪	১৪'১২	৮৪৩,৫৮৮
দঃ কানাড়া	৫৬'২২	১২'২৬	২৩৭,৮০২
ধর্মপুরী	৫৬'০২	৪'৬০	৭৭,১৮৭
কাউরা	৫৫'২৪	০'৮৯	১১,৭৮৭
সারগুজা	৫৫'১৫	২'০২	২৬,৭৬৬
দি-ডাঙস	৫৪'৭৬	১'২৮	১,২০৪
দুর্গ	৫৪'৭২	১'৬৪	৪০,৪১২
রাঁচী	৫৪'৬৭	৭'২৭	১৮৯,৯৪১
সুরাট	৫৪'৫৯	৮'০৭	১৪৪,১৬৭
কোয়েম্বাটুর	৫২'৯৪	৩ ৪৬	১৫২,০৪৯
আলোয়ার	৫১'৮৫	৯'০৪	১২৫,৭০৬
বালেশ্বর	৫০'৮৪	৩'৭৭	৬৮,৯৩৬
শিবপুরী	৫০'৭৭	২'৫৮	১৭,৪৩৫
রোটক	৫০'৪০	০'৬২	১১,০৫৩
ময়ূরভঞ্জ	৫০'২৮	০'৭৯	১১,৩৫৯

[*Population Geography of Muslims of India—Nafis Ali Siddique, pages : 42-43*]

মাত্র ২৮ জন মুসলিম সেখানে বসবাস শুরু করায় বৃদ্ধির হারের আর কোনো সীমা-পরিসীমা রইল না। ১৭টি জেলায় বৃদ্ধির হার ১০০-রও বেশি। কিন্তু ওই জেলাগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা খুবই কম। কখনো মোট জনসংখ্যার ৩'৩ শতাংশের বেশি নয়। দমন ব্যতিক্রম—এখানে মুসলিমরা ১১'২৪ শতাংশ। যেসব জেলায় বৃদ্ধির হার ৫০ থেকে ৯৯'৯ শতাংশ, সেসব জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি নয়। যা গড় শতাংশ ১১'২ থেকে কম। ব্যতিক্রম দেওরিয়া (ইউ পি), বম্বে এবং পশ্চিম কানাড়া (কর্নাটক)। এই জেলাগুলোতে মুসলিমরা ১১'২ শতাংশের বেশি।

আবার যেসব জেলায় মুসলিমরা সংখ্যায় যথেষ্ট, কোথাও-কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেসব জেলায় মুসলিমদের বৃদ্ধির হার গড় বৃদ্ধির হার থেকেও কম। কোনো-কোনো জেলায় মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। টেবল ৯-এ আমরা এর কিছু নমুনা দেখব।

টেবল—৯

জেলা	জেলার জনসংখ্যার মুসলিম শতাংশ ১৯৬১	১৯৭১	জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি	বৃদ্ধির হার ১৯৬১-৭১ (শতাংশে)
বরমুলা	৯৭'৩০	৯৫.৯০	−১'৪	২৭'১৬
অনন্তনাগ	৯৫'২০	৯৪.৮০	−০'৪	২৭'৪২
লাক্ষাদ্বীপ	৯৮'৬৯	৯৪.৩৭	−৪'৩২	২৬'১৯
শ্রীনগর	৯০'৬০	৯১.৪০	+০'৮	২৮'৪৪
পুনচ্	*	৮৮.৯০	*	৮'৫২
মালাপ্পুরম	*	৬৩.৯৩	*	৪৭'২৮
দোদা	৬৫'০০	৬৩.৬০	−১'১৪	২৮'২১
রাজৌরি	৭৯'৪০	৬১ ০০	−১৮'৪	১১'১৬
মুর্শিদাবাদ	৫৫'৮০	৫৬.৩০	+০'৫৪	২৯'৪৮
লাদাখ	৪৫'৫০	৪৬.৬৬	+১'১৬	২১'৯৯
রামপুর	৪৫'০০	৪৫.৭৬	+০'৭৬	৩০'৫৯
মালদা	৪৬'১০	৪৬.১৩	−২'৯৭	২৩'২৪
গোয়ালপাড়া	৪৩'৩০	৪২.২৫	−১'০৫	৪০'৫৭
কাছাড়	৩৯'১০	৩৯.৮৯	+০'৭৯	২৬'৭৮
পূর্ণিয়া	৩৭'৬০	৩৯.৬২	+২'০২	৩৪'১৮
নওগাঁও	৪১'২০	৩৯.৩৯	−১'৮১	৩২'৬২
মোরাদাবাদ	৩৭'৫৫	৩৮.১৫	+০'৯০	২৬'০০
বিজনোর	৩৬'৫০	৩৬.৬৬	+০'১৬	২৫'৫১
পঃ দিনাজপুর	৩৯'৪০	৩৫.৮৯	−৩'৫১	২১'৯৪
উধমপুর	৩৩'৮০	৩২.৯২	−০'৮৮	২৫'৯৬
সাহারানপুর	৩১'০০	৩১ ১১	+০'১১	২৭'৩১
কোঝিকোড়	৪৭'২০	৩০.৬২	−১২'৮৮	৩৩'০৬

জেলা	জেলার জনসংখ্যার মুসলিম ১৯৬১	শতাংশ ১৯৭১	জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি	বৃদ্ধির হার ১৯৬১-৭১ (শতাংশে)
বেরিলি	২৯·৮০	২৯·২০	−০·৬০	১৭·৬৮
বীরভূম	২৭·৬০	২৯·১৯	+১·৫৯	২৯·৭৫
কামরূপ	২৯·৩০	২৮·৯৩	−০·৩৭	৫৬·৩৫
মুজফফরপুর	২৭·৯০	২৮·৮৩	+০·৯৩	২৮·৬৪
বাহরাইচ	২৫·৫৫	২৬·৯৯	+১·৪৪	২১·৫৩
হায়দ্রাবাদ	২৭·১০	২৬·৪৫	−০·৫৫	৩৭·১৪
মাহে	*	২৪·৪৪	*	২২·৮০
জয়শলমীর	২৬·৪০	২৪·৪০	−২·০০	৯·৮৮
কান্নানোর	২৩·৫০	২৪·৩৪	+০·৮৪	৫৭·৪৪
২৪ পরগনা	২৩·৪১	২৩·৬৮	+০·২৭	৩৮·১২
নদীয়া	২৫·৩৭	২৩·৩৪	−১·০৩	২৪·৯৬
গোণ্ডা	২০·৯০	২২·৫৭	+১·৬৭	১৯·৯৯
মীরাট	২১·৯০	২২·১৪	+১·২৪	৩১·০৬
পিলিভিট	২০·০০	২১·৬২	+০·৬২	২৫·২৪
পালঘাট	২৮·০০	২১·২৭	−৬·৭৩	১৭·৭৬
কুচবিহার	২৩·৭০	২১·২৫	−২·৪৫	২৩·৯৮
বস্তি	১৮·৬০	২০·৩০	+১·৭০	২৩·৫৭

(Population Geography of Muslims in India, pp 44-45)

টেবল-৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭১-এর আদম-শুমারি অনুযায়ী মুসলিমরা ৯টি জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৬১-তে ছিল ৭টি জেলায়। এর কারণ পুঞ্চ (জম্মু এবং কাশ্মীর) এবং মালাপ্পুরম জেলা দুটি ১৯৬১-র পর গঠিত হয়। বাকি ৭টি জেলার মধ্যে শ্রীনগর বাদে সব জেলাতেই মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা কমেছে। এসব জেলার বৃদ্ধির হারও গড় বৃদ্ধির হার থেকে বেশ কম। গোয়ালপাড়াতে বৃদ্ধির হার ৪০·৫৭ হলেও মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসখ্যা ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এ কমে গেছে ১·০৫ শতাংশ। রাজাউরিতে কমেছে সবথেকে বেশি, ১৮·৪ শতাংশ।

যে ১৫টি জেলায় মুসলিমরা হ্রাস পেয়েছে, তার তথ্য টেবল-১০-এর দেওয়া গেল।

টেবল—১০

জেলা	জেলার জনসংখ্যার মুসলিম ১৯৬১	শতাংশ ১৯৭১	জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি	বৃদ্ধির হার ১৯৬১-৭১ (শতাংশে)
লাহুল-স্পিতি	৫·৯৬	০·১২	− ৫·৮৪	−৯৭·৭৭
দক্ষিণ ত্রিপুরা	২০·১০	৪·৩৪	−১৫·৭৬	−৭৯·৬৮
মণিপুর দক্ষিন	৬·২০	০·১৯	− ৫·০১	−৬৯·৪৩
কুলু	*	০·২১	*	−৬১·২০
পশ্চিম ত্রিপুরা	২০·১০	৬·৪৭	−১৩·৬৩	−৫৪·৮২
রোপার	*	০·৫৫	*	−৯৭·৫১
ঝিন্দ	*	১·২০	*	−৩১·২৭
খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়	১·১০	০·৭৩	− ০·৪৭	−২৪·৫৬
উত্তর ত্রিপুরা	২০·১০	৯·৩৮	−১০·৭২	−২০·৮৩
তেহরি-গাড়োয়াল	০·৫৮	০·৪৮	− ০·১০	−১৭·৭২
পুরুলিয়া	৬·০০	৪·৬৪	− ১·৩৬	− ৮·৭২
লুধিয়ানা	০·৪১	০·৪০	− ০·০১	− ৭·৬৯
হোশিয়ারপুর	০·৫০	০·৩৩	− ০·১৭	− ৭·০২
ছামোলি	০·৩৮	০·৩২	− ০·০৬	− ১·৯৬
মাহাস্থ	০·৮০	০·৬৭	− ০·১৩	− ১·০৫

(Population Geography of Muslims in India, p 46)

টেবল-১০ থেকে দেখা যাচ্ছে—লাহুল-স্পিতিতে (হিমাচল প্রদেশ) ১৯৭১ সালে মুসলিমরা প্রায় উবে গেছে বললেই চলে। ১৯৬১ সালে ছিল মোট জন-সংখ্যার ৫·৯৬ শতাংশ; ৭১ সালে হয়েছে ০·১২ শতাংশ। মণিপুরে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে মুসলিম জনসংখ্যা। ত্রিপুরার তিনটে জেলায় মুসলিমরা কমে গেছে ১০-১৫ শতাংশ।

এইরকম সব পরিবর্তন থেকে অবশ্য মনে করার কোনো কারণ নেই যে এসব ঘটে চলেছে প্রকৃতির অস্বাভাবিক নিয়মে। অর্থাৎ মৃত্যুহার, জন্মহার থেকে অনেক বেড়ে গেছে। আসলে, এসব ঘটছে জেলা থেকে চলে যাওয়া বা জেলায় নতুন বসতি স্থাপনের জন্যে। ত্রিপুরার সেনসাস কমিশনার বলেছেন: 'আমাদের ভালোভাবেই জানা যে ১৯৬১-র আগে পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) থেকে বেশ কিছু বেআইনি অনুপ্রবেশকারী ত্রিপুরার মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। এদের ফিরে-যাওয়া ত্রিপুরার মুসলিম জনসংখ্যায় প্রতিফলিত হয়েছে।'*

জেলাওয়ারি এই তথ্যগুলো থেকে আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তা হল—কেবল বৃদ্ধির হার দিয়ে মুসলিম জনসংখ্যার হিসেবনিকেশ আমাদের ধারণাকে একটা বড়ো ভুলের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। একমাত্র জেলাওয়ারি এই তথ্য থেকেই আমরা আন্দাজ পেতে পারি প্রকৃত অর্থে মুসলিমরা কতটা বেড়েছে সংখ্যায়; এবং তাদের এই বৃদ্ধি যে কোনোভাবেই হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না, তাও আমরা বাস্তবে ধারণা করতে পারি।

গত তেরোশো বছরের তথ্য ঘেঁটে দেখা গেল যে, মুসলিমরা অখণ্ড ভারতে সবথেকে সংখ্যায় বেশি হয়েছিল ১৯৪১-এ। জে. এম. দত্ত অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ২৩·৮১ শতাংশে বা কিসলে ডেভিস অনুযায়ী ২৪·২৮ শতাংশে। অবশ্য অনেকে মনে করেন, ১৯৪১ সালের জনগণনায় পাকিস্তানের যৌক্তিকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে মুসলিম জনসংখ্যাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছিল।

আর বিভাজন-উত্তর ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়িয়ে আছে ৯-১১ শতাংশে। অন্যদিকে গোড়া থেকেই হিন্দুরা আছে ৮০ শতাংশের কিছু ওপরে। আজো তাই। তেরোশো বছর ধরেই যদি জনগোষ্ঠীর নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও চিত্রটা এইরকমই থাকে, তবে আগামী তেরোশো বছরেও কি ছবিটাকে একদম উলটে দেওয়া সম্ভব? বিচারের ভার মনস্ক পাঠকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া গেল।

*Population Geography of Muslims of India, p 47.

ভি-এইচ-পি-র দাবি এবং একটি অঙ্ক

এবার আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেওয়া তথ্যকে বিচার করব। আগেই বলা হয়েছে—ওদের দেওয়া তথ্য সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে মেলে না। ওরা মুসলিমদের সংখ্যা অনেক ফুলিয়ে-কাঁপিয়ে দেখিয়েছে। তবুও প্রদত্ত তথ্য থেকে (টেবল-২) দেখা যাচ্ছে: মুসলিম জনসংখ্যা ১৯৫১ থেকে ১৯৮১-তে ৩·৫ কোটি থেকে হয়েছে ৮·৫ কোটি। অর্থাৎ গত তিরিশ বছরে মুসলিমরা সংখ্যায় বেড়েছে ৫ কোটি। এই হিসাবে প্রতি দশ বছরে গড়-বৃদ্ধি দাঁড়ায় ১·৬৬ কোটি (প্রায়)। ১৯৮১—২০০১ বা ২০ বছরে যদি এই হিসাবেও বাড়ে তবে মুসলিমরা বেড়ে হবে ১১·৮২ কোটি। তর্কের খাতিরে যদি মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার গত তিরিশ বছরের দ্বিগুণও ধরে নিই, তবুও ২০০১ সালে ওদের সংখ্যা হবে ১৫ কোটি। আর এই ২০ বছরে হিন্দুরাও তো বাড়বে। না হয় ধরেই নিলাম এই সময়ে হিন্দুদের বাড় থেমে থাকবে। তাহলেও কী করে এখনকার ৫৫ কোটি হিন্দুকে ছাপিয়ে যেতে পারে ১৫ কোটি মুসলমান? কোন্ গণিতবিশারদের উর্বর মস্তিষ্কে এমনধারা আজগুবি-অঙ্কের জন্ম।

এবারে একটা অঙ্ক কষা যাক। ১৯৮১-র তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ৫৫ কোটি আর মুসলিম ৭·৫ কোটি। অর্থাৎ সংখ্যায় হিন্দুদের থেকে বেশি হতে গেলে দরকার ৪৮ কোটি মুসলিম। যে ৭·৫ কোটি মুসলিম এখন আছেন, তাঁদের সবাই তো আর প্রজননক্ষম নন। বাচ্চা আছে, বুড়োবুড়ি আছেন। মুসলিমদের তো আবার কাঁড়ি-কাঁড়ি বাচ্চা! ধরে নেওয়া যাক এদের মধ্যে ৪·৫ কোটি ছেলে-বুড়ো।* বাকি ৩ কোটি নারী-পুরুষ প্রজননক্ষম।

* মুসলিমদের সন্তান-সংখ্যার হার ধরে গুনলে, সংখ্যাটা ৪.৫ কোটি ছাপিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে জোড়ের সংখ্যা আরো কমবে এবং সে-হিসাবে ৩৫টি সন্তানেও কুলোবে না।

তাহলে ১·৫ কোটি মুসলিম-জোড় থেকে ৪৮ কোটি সন্তান চাই। জোড়পিছু সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে ৩২। ওদের বর্তমান গড়-সন্তান সংখ্যা কম করেই ধরা যাক ৩১, তাহলে জোড়-পিছু মোট সন্তানসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩৫। অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম-দম্পতি যদি ৩৫ জন করে সন্তান উৎপাদন করতে পারেন তবেই কেবল ভি-এইচ-পি-র হুঁশিয়ারি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। (ধরে নেওয়া হচ্ছে এই সময় জুড়ে হিন্দুরা আর বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলায় জড়াবেন না)।

এমন একটা 'আষাঢ়ে অঙ্ক বা গপ্পোর' কি কখনোই বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব? সারা পৃথিবী ঢুঁড়ে, তার যে-কোনো প্রান্তের জনগোষ্ঠীর হিসাব নিয়েও কি পাওয়া যাবে এমন আজব তথ্য—গোষ্ঠীর প্রতিটি দম্পতির গড়-সন্তানসংখ্যা ৩৫? কূট-তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নেওয়া গেল—কোথাও নেই বলে হতে পারে না? যদি তা-ও হয়, তবেও তো সময়টা কম করে লাগবে ৩৫ বছর (অবশ্য যদি বিরতি-হীন উৎপাদনপ্রক্রিয়া চালু থাকে)। তাহলে ২০০০ সালের ভেতর হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবে কী করে মুসলিমরা? আর ৩৫ বছর ধরে একটানা প্রজননের হ্যাঁপা সামলাতে পারবেন কজন নারী? সে কথাও বিবেচনায় আনা উচিত বই কি।

মুসলিম-জনসংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি ওপরে আলোচিত তথ্য এবং যুক্তির বিচারে আমরা অবশ্যই একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি—তা হল ভি. এইচ. পি.-বি. জে. পি.-র 'মুসলিম জনবিস্ফোরণ'-এর তত্ত্বটি নেহাতই একটি ফাঁপা বেলুন। এর ভেতর সারবস্তু বলতে নেই কিছুই। যুক্তিতথ্যের বিচার মেনে নিলে ভি. এইচ. পি.-র দাবিকে একটা বাজে গপ্পো বলেই উড়িয়ে দিতে হয়। ওদের এই গপ্পোকে যদি সত্যি হতে হয়, তবে হয় মুসলিমদের 'রক্তবীজের ঝাড়' হতে হয় নতুবা আবার যদি দলে-দলে হিন্দু কলমা পড়ে ধর্ম বদলায় তবে অন্য কথা।

এবার দ্বিতীয় ধারণাটির বিচারে আসা যাক।

'ওদের চারটে করে বিয়ে আর কাঁড়ি-কাঁড়ি বাচ্চা!'

মুসলিমরা চারটে করে বিয়ে করে। ভারী আপশোস ভি. এইচ. পি.-র। কেননা গোলওয়ালকর তো বলেইছেন: 'যদি বহুবিবাহের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে মানুষ তো পতিতালয়ে যাবেই। কী করে ঠেকাবে?...'

'সেকুলার রাষ্ট্রে কেবল হিন্দুদের জন্যে এক-বিবাহের আইন খুবই অসঙ্গত।'*

সুতরাং 'ওদের চারটে করে বিয়ের' প্রবক্তাদের মনোভাব অনেকটা—হয় আমাদেরও চারটে করে বিয়ে করতে দাও, নয় ওরাও একটার বেশি বিয়ে করতে পারবে না।

'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' ভালো কি মন্দ, আজকের সমাজে এ আইন থাকা উচিত কি উচিত নয়, তা যেহেতু আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, সেজন্যে আপাতত এ প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক। কজন মুসলিম আজকাল এককালীন চারটে করে বিয়ে করেন, তাও আমরা পরে দেখব। কিন্তু একটা কথা তো সত্যি—ইসলাম অনুযায়ী মুসলিমদের চারটে করে বিয়ে করার অনুমোদন আছে। কিন্তু কেন? আমরা কি জানি মুহম্মদ কেন এবং কোন্ সামাজিক পরিবেশে এই বিধান দিয়েছিলেন? একটু ইতিহাসের পাতা ওলটানো যাক।

মুহম্মদের আমল এবং চার বিবাহ

প্রাচীনকালে কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহুবিবাহপ্রথার প্রচলন ছিল। হিন্দুদের বহু-বিবাহপ্রথা তো সবাই জানেন। এই সেদিন পর্যন্তও (হিন্দু কোড বিল গৃহীত হওয়ার আগে পর্যন্ত) হিন্দুরা বহুবিবাহ করতে পারতেন।

প্রাচীন মিডিয়ায়, ব্যাবিলনে, পারস্যে একজন পুরুষ কজনকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবেন, তার কোনো সীমা বাঁধা ছিল না। মুসার আবির্ভাবের আগে একজন হিব্রু পুরুষ কজন নারীর সঙ্গে বিবাহচুক্তি করবেন তারও কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। সিরিয়া-ফিনিসিয়ায় বহুবিবাহের প্রচলন ছিল অত্যধিক মাত্রায়।

প্রাচীন যুগের সভ্যজাতি এথেনীয়রা স্ত্রীকে পণ্য-রূপে বিবেচনা করত। স্ত্রী ছিলেন বিক্রয়যোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য এবং উইল করে দানযোগ্য। একজন এথেনীয় যে-কোনো সংখ্যায় স্ত্রী রাখতে পারত। স্পার্টার পুরুষরা একাধিক স্ত্রী না রাখতে পারলেও নারীরা একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারত।

রোমানদের মধ্যে আইনি বহুবিবাহের প্রচলন না থাকলেও দিগ্‌বিজয়ী রোমানরা যে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন তাতে বিবাহের নৈতিকতা বলে কিছু ছিল না। নতুন-নতুন রাজ্য জয় এবং সেসব রাজ্যের নারীদের দিয়ে নিজেদের প্রেম চরিতার্থ করাই ছিল রোমানদের রীতি। রাষ্ট্র উপপত্নী রাখতে অনুমোদন দিয়েছিল। ঘন-ঘন স্ত্রী পালটানো, হস্তান্তর আসলে অন্য নামে বহুবিবাহপ্রথাই।

এমন কী খ্রীষ্টান যাজকরাও তাঁদের চিরকৌমার্য ভুলে গিয়ে বহু বৈধ এবং অবৈধ নারীসংসর্গ করতেন। সম্রাট জাসটিনিয়ান আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করে দিতে চাইলেও, সমাজে তার খুব একটা প্রভাব পড়ে নি।

অনেক পাশ্চাত্য-পণ্ডিত মনে করতেন—মুহম্মদ বহুবিবাহপ্রথা গ্রহণ করেছেন এবং তা বৈধ করেছেন। এ ধারণা আজো সাধারণের মনে গেড়ে বসে আছে। কিন্তু বাস্তব তার ঠিক উলটো। কী চেহারা ছিল সমাজটার মুহম্মদের সময়ে?

'মুহম্মদ শুধু তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই নয়, প্রতিবেশী দেশসমূহের লোকদের মধ্যেও বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত রয়েছে দেখতে পেয়েছিলেন,·· বহু-বিবাহপ্রথা অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল এবং হতভাগ্য নারীরা, প্রথমা স্ত্রী যে সময়ের অগ্রাধিকার অনুসারে মনোনীত সে ছাড়া, সকলেই মারাত্মক অযোগ্যতার অধীনে দুর্দশা ভোগ করেছিল।

'মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদের সময়ে পারস্যে নৈতিক অধঃপতন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। বিবাহ সম্পর্কে কোনো স্বীকৃত বিধি ছিল না অথবা কোনো বিধি থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হত। কোনো পুরুষ কজন স্ত্রী রাখতে পারবে জেন্দ-আবিস্তায় কোনো নির্দিষ্ট বিধি না থাকায় পারসিক-গণ অনেকগুলি উপপত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও বহু-সংখ্যক নিয়মিত স্ত্রী রাখত।

'প্রাচীন আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছাড়া শর্তসাপেক্ষ ও অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। নৈতিকতার এসব শ্লথ ধারণাসমূহ উপদ্বীপের সমাজব্যবস্থার উপর নিদারুণ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল।...

'ইসলামের নবী তাঁর ধর্মের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে বলবৎ করেছিলেন "নারীর প্রতি সম্মান"।...

'আরবের নবী যে বিধি-বিধান ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে তিনি শর্তসাপেক্ষ বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন; অস্থায়ী বিবাহ যা প্রথমে মৌন সম্মতি লাভ করেছিল তৃতীয় হিজরিতে, এমনকী তাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। মুহম্মদ তাঁর জীবদ্দশায় এমন সব অধিকার নারীদের দিয়েছিলেন যা তারা এর পূর্বে কোনোদিন পায় নি; তিনি তাদেরকে এমন সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন যা কালের অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর পরিপূর্ণতার সঙ্গে মূল্যায়িত হবে। সমুদয় আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ও ভূমিকা পালনে তিনি নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একই সঙ্গে সর্বোচ্চ সংখ্যার সীমা নিরূপণ ক'রে এবং সকলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ আচরণ করে বহুবিবাহপ্রথার মধ্যে সংযম আনয়ন করেছেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে কোর-

* Spot Lights : M. S. Golwalkar : p 15-16

আনের মধ্যে যে অনুচ্ছেদে একই সময়ে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে তার অব্যবহিত পরে এমন একটি আয়াত এসেছে যা পূর্ববর্তী আয়াতের তাৎপর্যকে তার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত সীমায় এনে দিয়েছে। "তোমরা ছুটো, তিনটা কিংবা চারটি বিবাহ করতে পার, কিন্তু তার অধিক নয়।" এর পরবর্তী আয়াত ঘোষণা করে, "কিন্তু তোমরা যদি সকলের সঙ্গে সমভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে আচরণ না করতে পার, তবে তোমরা একটি-মাত্র বিবাহ করবে।" কোরআনের শিক্ষায় 'আদল' (ন্যায়বিচার) শব্দটিতে যে অর্থ আরোপিত হয়েছে তার অর্থবাহী এই অনুবিধির আত্যন্তিক গুরুত্ব মুসলিম জাহানের মহান চিন্তাবিদেরা বিস্মৃত হন নি। 'আদল' শুধু আহার, বাসস্থান, বস্ত্র ও অন্যান্য পারিবারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সমান আচরণ বুঝায় না, পরন্তু প্রেম-প্রীতি ও সমীহের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সমান আচরণ বুঝায়। যেহেতু অনুভূতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা অসম্ভব, কাজেই কোরআনিক ব্যবস্থা যথার্থই নিষেধাজ্ঞায় পর্যবসিত হয়েছিল। হিজরী তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছিল।* আল মামুনের রাজত্বকালে প্রথম মুতাজিলা পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে কোরআনিক আইনাবলী এক বিবাহের অনুশীলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও উন্মাদ ধর্মান্ধ মোতাওয়াক্কিল তাঁদের শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করেছিল তথাপি সর্বত্র, সব অগ্রগামী মুসলিম সমাজে এই বিশ্বাস জোরদার হয়ে উঠেছিল যে বহুবিবাহপ্রথা যেমন মুহম্মদের শিক্ষার বিরোধী তেমনি তা সভ্য সমাজ ও যথার্থ কৃষ্টির সাধারণ অগ্রগতির বিরোধী।'**

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু কেন, কোন্ অবস্থায় মুহম্মদ সর্বাধিক চার বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন তা জানার জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। পারস্য-আরবে বহুবিবাহের নামে যে অনাচার-অনৈতিকতা এবং নারীদের ওপর পুরুষশাসিত সমাজের দুরপনেয় অমর্যাদার বোঝা চাপানো হয়েছিল, মুহম্মদ তার অবসান চেয়েছিলেন। তিনি বহুবিবাহে সংযম আনতে চেয়েছিলেন। এবং বস্তুত তাঁর শিক্ষা একবিবাহের দিকেই পথ-নির্দেশ করে। ইসলামের যাঁরা প্রগতি পথিক তাঁরা মুহম্মদের এই শিক্ষাকেই প্রসারিত করতে চেয়েছেন। যদিও পরবর্তী কালের শাসকবর্গ এবং গোঁড়া মোল্লা-মৌলবীরা মুহম্মদের এই নির্দেশের অপব্যাখ্যা করেছিল।

তৎকালীন সমাজের আর-একটা দিকও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত গোষ্ঠীগুলির পুরুষরা নিহত হওয়ায় সমাজে নারীপুরুষের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সামাজিক অনাচার বাড়ে। নারী তার অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে নানা হীন পেশা নিতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা যে কতখানি বাস্তব তার প্রমাণ একালের দুটি বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের সময়ে সমস্ত বড়ো-বড়ো শহরে পতিতাবৃত্তি বেড়ে গিয়েছিল চূড়ান্তরকমে।

মুহম্মদ এই অনাচারের হাত থেকেও সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর চার বিবাহের বিধি। বহুবিবাহকে সংযমে বাঁধা, নারীকে তার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া এবং নির্যাসরূপে একবিবাহের পক্ষে নির্দেশ দান—এমন চিন্তা অবশ্যই সে যুগকালের বিচারে যথেষ্ট এগিয়ে-থাকা চিন্তা।

কিন্তু আধুনিক যুগে যখন পৃথিবী-জোড়া প্রায় সব সমাজই একবিবাহবিধি প্রণয়ন করেছে তখন এদেশের মুসলিমদেরও উচিত এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

বিধি যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে প্রশ্ন হল, মুসলিমরা সবাই কি চারটি করে বিয়ে করেন? এই প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন মনে উঁকি মারে—এমনকী বহুবিবাহের যুগেও শ্রমজীবী মানুষেরা কি সবাই বহুবিবাহ করতেন? করতে পারতেন? প্রাচীনকালে আদমশুমারির কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া দুষ্কর। ইতিহাসেও মেহনতি মানুষের পরিবারবৃত্তান্ত নেই তেমন। যা কিছু আছে রাজা-রাজড়া-নবাব-বাদশাদের। সমাজের ওপরতলার মানুষ সব। তাঁদের অনেকেরই বহুবিবাহ। আবার এঁদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁদের একবিবাহ। রামায়ণ-মহাভারতের কথাই ধরা যাক। দশরথ, অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম—এঁদের যেমন একাধিক বিবাহ, তেমনি রাম, তাঁর ভাইরা, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রোণ প্রমুখ প্রধান কুশীলবদের মধ্যে অনেকেরই একবিবাহ।

সুতরাং অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে কোথাও নারীর সংখ্যা, কোথাও-বা পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকায়, সামাজিক ঘাত-সংঘাতে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায়, সর্বোপরি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা না থাকায় বহুবিবাহের বিধি ছিল। ব্যাপক প্রচলনও ছিল। কিন্তু কখনোই বহুবিবাহ সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল কি না, এ নিয়ে ঘোর সংশয় থেকে যাচ্ছে।

এ সংশয়কে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ আধুনিক কালে 'প্রাইমেট'-দের আদমশুমারি-সমীক্ষা-লব্ধ তথ্য থেকে তাদের নারী-পুরুষের অনুপাতগত নানা ধরন (প্যাটার্ন) দেখা গেলেও এই অনুপাতে একটা ভারসাম্য থাকে। এ বিষয়ে একেবারে নির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া গেলেও নির্দ্বিধায় বলা যায়—স্থান-কাল-ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের নারীপুরুষের অনুপাতে নানা হেরফের থাকলেও, গড় হিসাবে এই অনুপাতে একটা ভারসাম্য থাকে। সেজন্যে প্রাচীন কালেও সব মানুষই বহু বিবাহ করতে পারতেন কিনা, এ সংশয় থেকেই যায়। প্রাচীন কালের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বহু-বিবাহপ্রথার সর্বজনীন চল ছিল কিনা তা নতুন করে অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

প্রাচীন যুগে সর্বজনীন বহুবিবাহ কতটা সম্ভব ছিল তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ হলেও আধুনিক যুগে কিন্তু নিঃসংশয়েই বলা যায় বেশির ভাগ মানুষ বর্ণ-ধর্ম-জাতিনিরপেক্ষভাবে একবিবাহতেই সীমাবদ্ধ। তার দুটি কারণ—একটি আর্থিক, অন্যটি প্রাকৃতিক।

বলার অপেক্ষা রাখে না, যাঁদের নুন আনতে পানতা ফুরোয়, যাঁরা এক বউয়ের খোরপোশ জোটাতে চোখে সর্ষের ফুল দেখেন; তাঁদের পক্ষে চার বিয়ে তো অনেক পরের কথা, দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তাও মনে আনা পাপের শামিল। আর গরিবরা, তাঁরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান—যে ধর্মসম্প্রদায়েরই হোন না কেন, তাঁদের হাঁড়ির হাল তো একই থাকে। সেজন্যে গরিব মুসলিমের পক্ষেও একাধিক বিয়ে কোনো ঝাড়ফুঁকেও সম্ভব নয়।

এ ছাড়া পৃথিবীর সব প্রান্তেই নর-নারীর যে অনুপাত তাতে যে-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের ভেতর একাধিক বিয়ের সর্বজনীন রূপ পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

১৯৮৫-র আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতি ১০০০ পুরুষে আমেরিকায় নারীর সংখ্যা ১০৫১, রাশিয়ায় ১১৯০, জাপানে ১০৩৫।* দেখা যাচ্ছে, এই তিনটি দেশেই নারীর সংখ্যা পুরুষের থেকে বেশি। কিন্তু এমন কিছু বেশি নয় যাতে পুরুষরা প্রত্যেকেই একাধিক বিয়ে করতে পারে। ভারতে নারী-পুরুষের এই অনুপাত কেমন? ১৯৮১-র সেনসাস রিপোর্ট থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা—হিন্দু—৯৩৩, মুসলিম—৯৩৭,

* 'দি রাদ্দ-উল-মুহতার' সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, "কোন কোন বিশেষজ্ঞ (মুতাজিলা) অভিমত পোষণ করেন যে 'আদল' প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে সাম্য বুঝায়, কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁরা নাফ্‌কাহ্‌র ক্ষেত্রেই সমান আচরণকে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা আইনের ভাষায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা বুঝায়।"

** দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম: স্যর সৈয়দ আমীর আলী: মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা। পৃ ৩২১-৩২৪।

* তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা। ২১.১১.১৯৯০

খ্রীষ্টান—৯৯২, শিখ—৮৮০, বৌদ্ধ—৯৫৩, জৈন—৯৪১।*

অর্থাৎ, ভারতে সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। সুতরাং কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষজনের প্রত্যেকেরই একাধিক বিয়ে করার উপায় নেই কোনো। মুসলিমদের ১০০০ পুরুষে নারীর অনুপাত ৯৩৭। চারটে করে বিয়ে করতে গেলে চাই ৪০০০ নারী; এমনকী দুটো করে বিয়ে করতেও দরকার ২০০০ নারী! যাঁরা যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারেন, সুস্থ মাথায় চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা কি এরপরও এমন কুৎসায় কান দেবেন—'ওরা সবাই চারটে করে বিয়ে করে।'

হিন্দুদের ভেতর এখন আইনত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেকারণে কি সমাজের কতিপয় মানুষের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে কোথাও বাধছে? সিনেমার জগতের নায়ক-মহানায়করা, সাহিত্যের কিছু রথী-মহারথী অক্লেশে একাধিক বিবাহ করছেন। পাড়ায়-পাড়ায় যদি একটু নজর করা যায় তবে দেখা যাবে সব পাড়াতেই এক-আধজন আছে যাদের একাধিক বিবাহ। কেউ না জানিয়ে হয়তো দু-জায়গায় সংসার পেতেছে। কেউ-বা বুক বাজিয়ে এক বাড়িতেই দু-তিন সতীনকে পদতলে ঠাঁই দিয়েছেন। আমাদের পাড়াতেই ছিলেন অশোকের বাবা (ওঁর নামটা মনে নেই)। বর্তমানের এক নামজাদা মন্ত্রীর ঠিক পাশের বাড়িতেই। এই সেদিন পাড়ায় গিয়ে শুনলাম পাড়ার এক বিদগ্ধ দাদা নাকি দীর্ঘদিন দু-জায়গায় দুটি সংসার চালাতেন। প্রথমা স্ত্রী সে কথা জানতেন। মানিয়ে নিতে হয়তো বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দাদা যখন তৃতীয়ার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন বোধকরি মহিলা আর সামলাতে পারেন নি নিজেকে। ফলে জানাজানি।

এই সেদিন দেখলাম জনৈকা শান্তি দেব লিগ্যাল এইড কমিটির (রাজ্য-সরকারের) কাছে জানিয়েছেন তাঁর স্বামী নিতাইচরণ দেব স্ত্রী বর্তমান থাকতে সবিতা কর্মকার নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। শান্তি দেব আদালতে নালিশ ঠুকলে আদালত জানান—বাদী-পক্ষ দ্বিতীয় বিয়ের "হোম" এবং "সপ্তপদী" অনুষ্ঠান হয়েছিল কিনা সেটা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন; ফলে দ্বিতীয় বিয়ে সিদ্ধ হয়েছে কিনা তাও বলা যায় না। এরপর শান্তি দেব হাইকোর্টে যান। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়, কারণ এই আবেদনের কোনো যাথার্থ্যই নাকি নেই।

এই চিঠির ওপর "বিচারের বাণী"-র (লিগ্যাল এইড কমিটির মুখপত্র) সম্পাদক মন্তব্য করেন—শান্তি দেবের যন্ত্রণা এবং বেদনা অনুভব করা গেলেও কমিটির কিছু করার নেই। ইনডিয়ান পেনাল কোডের U/S494 ধারায় মামলা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দ্বিতীয় বিয়ের সংশয়াতীত প্রমাণ চাই।**

এসব অভিজ্ঞতা কমবেশি আমাদের সবার আছে। কিন্তু এসব নিয়ে আমরা তো কেউ তেমন সমীক্ষা চালাই নি। ফলে ছবিটা আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়।

কিন্তু এ বিষয়ে আলো ফেলেছেন সোস্যাল স্টাডিজ ডিভিশন অব রেজিস্ট্রার-জেনারেল অব ইনডিয়া। ওঁরা ভারতের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বিভিন্ন প্রান্তের ৫৮৭টি জেলায় একটি নমুনা সমীক্ষা করেছিলেন। সমীক্ষাতে দেখা গেছে ১৯৬১-র পূর্ববর্তী দশ বছরে বহুগামিতা বা বহুবিবাহ (অবাক হবেন না যেন) মুসলিমদের মধ্যে সবথেকে কম! সমীক্ষার ফলাফল—বহুবিবাহ বা বহুগামিতায় মুসলিম—৪·৩%, হিন্দু—৫·০৬%, জৈন—৪·৪%, বৌদ্ধ—৮·১৬%, এবং উপজাতিবৃন্দ—১৭·০৮%।*

এই নমুনা সমীক্ষা থেকে আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি—বহুবিবাহ ভারতের ধর্মসম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী-গুলির স্বাভাবিক রূপ আদৌ নয়। ব্যতিক্রমী রূপ। এমনকী যে উপজাতিরা বহুবিবাহে শীর্ষে আছেন** তাঁদেরও মাত্র ১৭·০৮ শতাংশ একাধিক বিবাহ করেন। আর যে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু-কিছু মতলববাজ মানুষ মুসলিমদের সম্পর্কে 'ওরা চারটে করে বিয়ে করে' বলে জগৎ মাত করে, সেই হিন্দু সম্প্রদায়ও কিন্তু একাধিক বিয়ে করায় তাঁদের মুসলিম ভাইদের থেকে পিছিয়ে তো নেই-ই, বরং এক কদম এগিয়ে!

এবার 'ওদের কাঁড়ি-কাঁড়ি বাচ্চা প্রসঙ্গ'।
হাম দো-হামারা দো

প্রচার চলছে পুরোদমে—মুসলিমদের নাকি অগুনতি সন্তান। ওদের নাকি ধর্মে মানা আছে; সেজন্যে ওরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে না। দেখা যাক, এই কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, ইসলামে এমন কোনো নির্দেশ নেই যা দিয়ে বলা যায় মুসলিমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে ধর্মচ্যুত হবেন। যদিও মোল্লা-মৌলবীরা এমন সব ধারণা ইসলামের নামে প্রচার করে থাকেন এবং সরল সাধারণ মুসলিম নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাসও করেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, গরিব মানুষের মধ্যে সন্তানসংখ্যা বেশি। তার নানা কারণ। অন্যতম মূল কারণ কৃষিকাজ শুরুর সময় থেকে প্রচলিত ধারণা—যত হাত, তত ভাত। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ-গুলির বিপুল জনসংখ্যা এর একটা বাস্তব প্রমাণ।

ভারতবর্ষের মুসলিমরা একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়। কেন, কোন্ ঐতিহাসিক, সামাজিক কারণে আজ মুসলিমরা পিছিয়ে পড়েছে, কতটা পিছিয়ে পড়েছে এই সম্প্রদায়, তা নিয়ে পরে আমরা আর কোনো প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করব।

এই প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বললে ভারতে মুসলিম-দের অনগ্রসরতার মাত্রা কতটা সেটা বুঝতে সুবিধে হবে। "স্বাধীনতার পর যে স্থানত্যাগী ব্যক্তির সম্পত্তি আইন (Evacuee Property Law) গৃহীত হয়, তা মুসলিমদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ওদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে। এই আইনে বলা আছে (Intending evacuee) 'যিনিই স্থানত্যাগ করতে চান' তিনি ভারতে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না। ভারতে মুসলিমদের সাধারণত রীতি অনুযায়ী যৌথ সম্পত্তি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। উপরের আইন মোতাবেক পরিবারের একজনও যদি পাকিস্তানে চলে যান তাহলে সমগ্র সম্পত্তিই কর্তৃপক্ষের তদারকিতে চলে যাবে। এবং পরিবারের অন্যান্য শরিকরা তাঁদের ভাগ বিক্রিও করতে পারবেন না বা বন্ধক রেখে ঋণ সংগ্রহও করতে পারবেন না। 'স্থানত্যাগ করতে চান' এই পরিভাষার অর্থকে এমন প্রসারিত করা হল যে একটা সময়ে প্রায় সব মুসলিমই এই আইনের আওতার মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁদের সম্পত্তি বিক্রয়যোগ্য নয় বলে ঘোষিত হল। ...এমনকী প্রয়োজনে টাকা ধার না করতে পেরে অনেকের ব্যবসাই লাটে উঠল।'

'দেখা গেছে, মুসলিম শ্রমজীবীর একটা বিশাল অংশ খুবই কম বেতনে, অসংগঠিত কুটির শিল্পে নিয়োজিত; ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন।'

'সরকারী এবং সরকারী-উদ্যোগে (Public

* [*Census of India* : 1981, Series 1, Paper 3 of 1984 'Household Population by Religion of Head of Household']

** "বিচারের বাণী" : ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ৩৬

* *Educating a Backward Minority*; M. K. A. Siddiqui, ABADI Publications, page 45.

** উপজাতিদের মধ্যে বহুবিবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকার কারণ ওদের কোথাও-কোথাও নর-নারীর অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা।

Sector) মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম।* বিভিন্ন চাকরিতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব টেবল-১১)-তে দেখুন।

টেবল—১১

বিভিন্ন চাকরিতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব
(শতাংশে) : ১৯৮০-৮১

নিযুক্তকারী	১ম শ্রেণীর চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	২য় শ্রেণী সুপার-ভাইজর	৩য় শ্রেণী সুপার-ভাইজর (নন-টেকনিকাল)	৪র্থ শ্রেণী শ্রমজীবী
কেন্দ্রীয় সরকার	১.৬১	৩.০০	৪.৪১	৫.১২
রাজ্য সরকার	৩.৩০	৪.৪৮	৪.৬২	৬.৩৫
কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারী উদ্যোগ	৩.১৯	৪.৩০	১২.১৪	১০.৪৬

Source: *Paper circulated by Minorities Commission* New Delhi, Published in *Muslim India*, Dec. 1983, p 552.

খুবই বিক্ষিপ্ত এই তথ্যগুলোও কিন্তু আমাদের মেনে নিতে বাধ্য করে যে বর্তমান ভারতে মুসলিম সম্প্রদায় যথেষ্ট পিছিয়ে আছে।

তাহলে পিছিয়ে-থাকা সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ যখন গরিব, তখন তাঁদের সন্তানসংখ্যাও একটু বেশি হওয়া স্বাভাবিক। একই সঙ্গে আর-একটা দিকেও নজর করতে হবে। গোটা পৃথিবীতেই লক্ষ করা গেছে যেখানেই কোনো সম্প্রদায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, সেখানেই জন্মনিয়ন্ত্রণে তাঁরা মানসিকভাবে বেঁকে বসেছেন। অথচ সেই একই সম্প্রদায়, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে কিন্তু তাঁদের জন্মনিয়ন্ত্রণে আপত্তি নেই। হিন্দুরা ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু। এখানে তাঁদের জন্মনিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো গুরুর-আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশে আছে, কেননা সেখানে তাঁরা সংখ্যালঘু। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের যথেচ্ছ চল। অথচ ভারতে সংখ্যালঘু খ্রীষ্টান সম্প্রদায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ভেতর কেউ বড়ো একটা যান না। মুসলিমরা নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় নিজেরাই জন্মনিয়ন্ত্রণ চালু করেছেন। তাঁরা ওসব দেশে সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়। অথচ যেহেতু তাঁরা ভারতে সংখ্যা-লঘু, সুতরাং এদেশের মুসলিমদের জন্মনিয়ন্ত্রণে ঘোর আপত্তি।

আবার বর্ণগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও একই আচরণ। আমেরিকার কালো-মানুষরা (ধর্মে খ্রীষ্টান হলেও) যেহেতু শাদাদের তুলনায় সংখ্যালঘু, সেকারণে তারাও আদৌ আগ্রহী নয় জন্মনিয়ন্ত্রণে।

বলা যায়—কোনো ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়ের কোনো বিশেষ আচরণের বহিঃপ্রকাশ নয় এটা জন্মনিয়ন্ত্রণ করব না, তাহলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব—যেকোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিকতায় এই বোধ কাজ করতে থাকে। বুঝতে কষ্ট হয় না এই মানসের পেছনে কাজ করে নিরাপত্তার অভাব-বোধ।

এই আলোচনায় যে কথাটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হল, তা হল জন্মনিয়ন্ত্রণ না-মানা, জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়া ভারতের মুসলিমদের একচেটে নয়। যেখানেই যে-সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, সেখানেই তাদের জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি।

কিন্তু কতটা বেশি? ভারতে হিন্দু-মুসলিমদের জন্মহারে কি আকাশ-পাতাল ফারাক? কতটা ফারাক তা আমরা পরের পৃষ্ঠার টেবল-১২-তে দেখি।

টেবল-১২-তে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭২-এ গ্রামে হিন্দু জন্মহার যখন ৬'১, মুসলিমদের ৭'৬; শহরে হিন্দু যেখানে ৫.৮, মুসলিম ৬'৮। আর ১৯৭৮-এ গ্রামে

* বিচারের বাণী : ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, Position of the Muslim Minority in the Indian Polity : An Acid Test of Secularism—Prof. Debi Chatterjee, p 33

টেবল—১২

সম্প্রদায়	জন্মহার ১৯৭২ গ্রাম	১৯৭২ শহর	১৯৭৮ গ্রাম	১৯৭৮ শহর
হিন্দু	৬'১	৫'৮	৫.৪	৪'৫
মুসলিম	৭'৬	৬'৮	৬.১	৫'৪
খ্রীষ্টান	৬'৩	৫'৮	৫.৪	৪'৮
শিখ	—	—	৫.৮	৫'৪
সব ধর্ম	৬'১	৬'০	৫.৬	৪'৭

('*Communalism: Its Causes and Consequences*' p 55.

হিন্দু ৫'৪, মুসলিম ৬'১; শহরে হিন্দু ৪'৫, মুসলিম ৫'৪। শাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্মহারের পার্থক্যটা তেমন কিছু নয়। এই হারেই যদি সন্তানসংখ্যা বাড়ে (হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই) তবে ভারতবর্ষে মুসলিমদের যে কোনোদিনই সংখ্যা-গরিষ্ঠে পরিণত হওয়ার আশা নেই, সে কথা বোধ হয় আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বহুবিবাহ করে বলেই মুসলিমদের সন্তান বেশি, ফলে তাদের বৃদ্ধির হারও বেশি—এই ধারণা যে কতটা নড়বড়ে, তার জন্যে জেলাওয়ারি মুসলিমদের নর-নারীর অনুপাত এবং তাদের বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্যের ওপর একবার চোখ বোলানো যাক।

টেবল—১৩

জেলা	মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত	সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত	মুসলমান সংখ্যা-বৃদ্ধির হার (শতকরা) ১৯৬১-৭১	সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যা
মাহে	১,৩৫৬	১,১৭০	২২'৮০	২২'৪৪
রত্নগিরি	১,৩০৮	১,২৫০	১৫'২৬	৬'৩৩
তেহরি-গাড়োয়াল	১,৩০৬	১,১৯৯	—১০'৭৯	০'৪৮
রামনাথপুরম	১,২৩২	১,০৪৪	২৭.৪১	৬.৯৮
কাবিকল	১,২১৮	১,০২৩	১৭.২১	১৩.৫৬
দিউ	১,১৮৬	১,২২১	৪০.৫৮	৫.৯৩
দমন	১,১৪৫	১,০৩১	১৩.০৮	১১.২৪
ইয়ানম	১,১৩৩	১,০২৪	৪১.২০	৪.৮৪
তাঞ্জোর	১,১১৯	৯৯৫	২৯.৭৩	৬.৮৮
তিরুনেভেলি	১,১১৮	১,০৪৪	২২.৪৬	৭.০২
কোলাবা	১,১১২	১,০৫৮	৩১.০৭	৬.৫৪
ঝিচুর	১,১০০	১,০৮৩	৩৩.৬৯	১৩.৬৯
দুঙ্গারপুর	১,০৯৪	১,০১৮	৪১.৮৩	২.৭০
গয়া	১,০৮৮	৯৭৪	৩০.৭৪	১০.০৭
সারণ	১,০৭১	১,০৫৬	৩১.২৭	১৩.১৮
মাহেসানা	১,০৬৪	৯৬১	৩১.৮০	৬.২৫
মুজফফরপুর	১,০৫৭	৯৯২	২৫.৮৭	১৩.৬৭
প্রতাপগড়	১,০৪৪	১,০২৫	১৯.০৬	১১.৭৯
বাঁসোয়ারা	১,০৪২	৯৭৮	৩৮.৯৮	২.৬৪
গাজিপুর	১,০৩৫	৯৮৪	৩৪.০১	৯.৪৮
মালাপুরম	১,০৩৪	১,০৪২	৪৭.৯৮	৬৩.৯৩
দ্বারভাঙ্গা	১,০৩৪	৯৮৬	২৭.১১	১৪.৭০
শিকার	১,০৩৩	৯৬৮	৪৬.০৭	৯.৩৩
কটক	১,০২৬	৯৮৯	৪৪.২৫	৩.৪৮
কান্নানোর	১,০২২	১,০২০	৩৭.৪৪	২৪.৩৪
লাক্ষাদীপ	১,০১৫	৯৮৭	২৬.১৯	৯৪.৩৭
জৌনপুর	১,০১৩	১,০২০	১৫.৬৫	৮.৩১
উ: কানাড়া	১,০১৩	৯৫৯	৩২.৭৯	৮.৩৬
পালঘাট	১,০১০	১,০৫৯	১৭.৭৬	২১.২৭
রাজকোট	১,০০৮	৯৪৮	২২.৫৮	৯.৪৬
হাজারিবাগ	১,০০২	৯৮০	৪০.৯২	১৩.১১
মুঙ্গের	১,০০১	৯৩৫	২৮.৪৬	৯.১০
বিলাসপুর	১,০০০	১,০০৪	৪৪.৭৮	১.৫২

(Population Geography of Muslims in India : p 50)

টেবল ১৩-র প্রায় সব জেলাতেই মুসলিম নারীর সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি। সবথেকে বেশি মাহে জেলায়—হাজার পুরুষে ১,৩৫৬ নারী। আর বিলাসপুর জেলায় সমান। অর্থাৎ এইসব জেলায় মুসলিম পুরুষদের সবাই চারটে করে বিয়ে না করতে

পারলেও অনেকেই একাধিক বিয়ে করতে পারেন এবং তার ফলে সন্তানসংখ্যা বাড়লে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হবে।

কিন্তু টেবল-১৩ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বেশি দমন-এ। ৪০-এর কিছু কমবেশি বৃদ্ধির হার ৯টি জেলায়। গড় বৃদ্ধির হার (৩০·৮৫) থেকে কিছু বেশি ৭টি জেলায়। বাকি ১৬টি জেলায় মুসলিমদের বৃদ্ধির হার গড় বৃদ্ধির হার থেকে কম। তেহরি-গাড়ওয়ালে যেখানে মুসলিম নারীর সংখ্যা প্রতি ১০০০ হাজার পুরুষে ১৩০৬; সেখানে বাস্তবে বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক (−১০·৭৯)। অর্থাৎ একাধিক বিয়ে করে, কাঁড়ি-কাঁড়ি সন্তানের জন্ম দেওয়া মুসলিমদের রেওয়াজ—এই ধারণা ধোপে টেকে না।

এরই ঠিক পালটা তথ্যটা বেশ মজাদার। যেসব জেলায় মুসলিমদের নর-নারীর অনুপাত যথেষ্ট ভারসাম্যহীন, অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা খুবই কম, সেইসব জেলায় মুসলিমদের বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। টেবল-১৪ তে আমরা তা দেখব।

টেবল-১৪ তে দেখছি প্রতি ১০০০ পুরুষে মুসলিম নারীর সংখ্যা সবথেকে বেশি ৫৯৩ আর সবথেকে কম ৯৬। এখানে পুরুষদের একাধিক বিবাহের কথাই ওঠে না। অবশ্য নারীরা পারেন। কিন্তু ইসলামে তো নারীদের এককালীন একাধিক বিবাহের অনুমতি নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এসব জেলায় বৃদ্ধির হার অনেক কম হওয়াই উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মোককচঙে—যেখানে ১০০০ পুরুষে ৯৬ জন মাত্র নারী, সেখানে বৃদ্ধির হার ১,১২০·৭৫ কিনৌরে যেখানে ১০০০ পুরুষে ১৬৬ জন মাত্র নারী সেখানে বৃদ্ধির হার অসীম। অর্থাৎ এখানেও 'একাধিক বিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি বাচ্চা, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধির হার'—এ তত্ত্ব খাটছে না। কেন, এসব জায়গায় বৃদ্ধির হার অমন অস্বাভাবিক, সে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

টেবল—১৪

জেলা	মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত	সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত	মুসলমান সংখ্যা-বৃদ্ধির হার	সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যা
মোককচঙ	৯৬	৯০৭	১,১২০.৭৫	০.০০৪
মণিপুর পূঃ	১১১	৯৭৮	১৩০.৭৭	০.০৫
কিনৌর	১৬৬	৮৯৩	অসীম	০.০৬
সুবনসিরি	২৩৭	৯৬৫	তথ্য নেই	০.১৩
সিয়াং	২৪৭	৮০৪	তথ্য নেই	০.২৬
কোহিমা	২৮৮	৮০৪	১৭৭.৬৬	১.০৭
লোহিত	৩৮৮	৮২৭	তথ্য নেই	০.৪০
কামেঙ	৩৮৯	৮৯৪	তথ্য নেই	০.১২
তিরাপ	৪৭০	৯৩০	তথ্য নেই	০.০৫
কলকাতা	৪৭১	৬৩৮	১৯.৪৬	১৪.২০
মিকির পর্বত	৪৭৩	৮৭৯	৬২ ৮৯	৪.৩০
গাড়োয়াল	৪৮২	১১৭৯	৮৩.০৮	১.৬১
মিজোরাম	৪৯৮	১০১৮	৮২৭.০৯	১.৫৭
মণিপুর উঃ	৫৫৮	৯৫৬	২,৭৭৬.৯২	০.৩৬
উত্তর কাশী	৫৭১	৮৯৬	১৩৭.৬০	৩.৩৯
খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়	৫৭৭	৯৫২	−২৪.৫৬	০.৭৩
উঃ কাছাড় পাহাড়	৫৯৩	৮৪৩	৩৮.১৯	০.৮৬

(Population Geography of Muslims in India : p 53)

এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাঠকের মনে হয়েছে মুসলিম জনবিস্ফোরণ, ওদের চারটে করে বিয়ে এবং গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা—এসব ধারণার আদৌ কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তথ্য এবং যুক্তি এসব অমূলক ধারণাকে পুরোপুরিই খারিজ করে দেয়। সেজন্যেই আমাদের বুঝতে আরো অসুবিধে হয় না: এইসব মিথ্যাকে অবিরত পুনরাবৃত্তির দ্বারা 'সত্য' রূপে চালানোর উদ্দেশ্য একটাই—ব্যাপক হিন্দুমানসে মুসলিম-বিদ্বেষবীজ বপন করা। কালে-কালে তা যাতে মহীরুহে পরিণত

হয় এই আশায়। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর এই আশা যে আজ বাস্তবে অনেকখানি গা-জোয়ারি করে হিন্দুমানসে ক্রমেই উন্মাদনার সৃষ্টি করে চলেছে—এ সত্যকেও বা অস্বীকার করা যায় কী করে? কিন্তু আজ বোধ হয় ওদের এই মিথ্যার বেসাতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সময় এসেছে। আজ আর-একবার দেশ, সমাজ, তার মানুষজনকে নতুন করে যুক্তিতথ্যের আলোয় বিচার করার সময় এসেছে। সে বিচারের ধারায় আমাদের খুঁজে পেতে হবে ঈপ্সিত পথ। সে বিচারের ধারায় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সমান মর্যাদায় বাঁচবে।

সংযোজন :

আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল এই আলোচনার শেষে একটা নমুনা সমীক্ষা পেশ করা। কারণ, এখনকার নানা জনবসতির থেকে মুসলিমদের বাস্তব অবস্থান তুলে ধরতে পারলে ছবিটা আরো স্পষ্ট হতে পারে পাঠকের চোখে। কিন্তু সময় এবং লোকের অভাবে কাজটা ঠিক ঠিক করা যায় নি। আশা করি ভবিষ্যতে এই খামতিটুকু কাটিয়ে ওঠা যাবে। তবুও যতটুকু সমীক্ষা করা গেছে তার ফলাফল নীচে জানানো হচ্ছে।

আমরা প্রথমে বেছে নিয়েছিলাম হাওড়ার বাঁকড়া অঞ্চলকে। কেননা এখানে বহু মুসলিম একজোট হয়ে থাকে। বাঁকড়ার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোল্লা-মৌলবীও ওখানে যথেষ্ট। মসজিদগুলোর সংস্কার করে ঝকঝকে চেহারা। বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে হাওড়া-হাটে তৈরি-বস্ত্র চালানে। ওস্তাগর (মালিক), মেট (কাটার), দরজি—এইসব পেশার লোকজনই প্রায় সব। বোতামঘর করা, বোতাম লাগানো, হেম দেওয়া—এসব কাজে ঘরের বউ-ঝিরাও হাত লাগান। শিশু-শ্রমিকসংখ্যাও খুব একটা কম নয়। ওস্তাগরদের গড় মাসিক আয় ১০০০-২০০০ টাকা। দরজি-মেটদের ৪৫০-৮৫০ টাকা আর বাকিদের ২৫০-৫০০ টাকা।

এমন একটা আয়সীমা, মোল্লা-মৌলবীদের দাপট এবং নিরাপত্তার কারণে নানা জায়গা থেকে সরে আসা মুসলিমদের এখানে একজোট হয়ে বসতি—এইসব কারণে আমাদের সমীক্ষার এক আদর্শ বলে মনে হল বাঁকড়াকে।

এক-একটা পাড়া ধরে, একদিক থেকে তথ্য নিতে-নিতে মোট প্রায় পাঁচ শ পরিবারের তথ্য যোগাড় করা গেছে। দেখা গেছে—এই ৫০০ পরিবারের মধ্যে একাধিক বিয়ে মাত্র ৫ জনের। একাধিক বলতে অবশ্যই চারটে নয়। চারজনের দুই বিয়ে। এঁদের মধ্যে তিনজন প্রথমা স্ত্রী গত হওয়ার পর দ্বিতীয়াকে বিয়ে করেছেন। একজনের শুধু এককালীন দুই বিয়ে। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী আবার হিন্দুর মেয়ে। যেহেতু তিনি প্রথমা স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন সেজন্যে যথেষ্ট বিত্ত-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও পাড়া-পড়শিরা (সবাই মুসলিম) তাঁকে আদৌ পছন্দ করেন না। এড়িয়ে চলেন। এক যুবক জানালেন, পাড়ায় লোকটা বস্তুত একঘরে হয়ে আছে। আর-একজন তাঁর প্রথমা স্ত্রী গত হলে এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেন। প্রথমা এবং দ্বিতীয়াকে কিছু সন্তান উপহার দিয়ে সে তৃতীয়-বার বিয়েতে বসে। বাঁকড়া অঞ্চল পঞ্চায়েত তার বিচার ক'রে ২৫০০০ টাকা জরিমানা করে এবং সে লোকটি এখন এলাকা থেকে বিতাড়িত। বলা ভালো, লোকটির জীবিকার্জন খুব একটা সুস্থ পথে নয় এবং লোকটি মদ্যপ। তার বড়োছেলেকে 'বাবা কী করেন' প্রশ্ন করায় উত্তর আসে: 'কী আবার করবে। দু নম্বরি।' সেই ছেলেই এখন সংসার চালায়।

এই ৫০০ পরিবারে দেখা গেছে বহুবিবাহ তো দূরস্থান, একাধিক বিবাহই বিরল ঘটনা। ৪৯৫টি পরিবার এক বউ নিয়েই ঘর করছে। আর প্রথম স্ত্রী গত হলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ হিন্দু সমাজেও কোনো বিরল ঘটনা নয়। বাকি মাত্র দুজন (যারা মুসলিম

সমাজেই পরিত্যক্ত) একসঙ্গে দু-বউ নিয়ে থাকছে। এই ব্যতিক্রমী চেহারা হিন্দু সমাজেও খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়; তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই ৫০০ পরিবারও কি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না—'মুসলিমদের চার বিয়ে' কতখানি অভিসন্ধিমূলক কুৎসা!

এই ৫০০ পরিবারের গড় সন্তানসংখ্যা পরিবার-পিছু ৩·৯৩। ধরা যাক ৪। যা মুসলিমদের এমনকী হিন্দুদেরও ভারতীয় গড় জন্মহার থেকে অনেক কম। যেহেতু এটা শহরাঞ্চল, এবং ঠিক বস্তি বলা যায় না বাঁকড়াকে কোনোমতেই, সেজন্যে স্বাভাবিক কারণে এখানকার গড় জন্মহার খুব বেশি নয়। এ সম্পর্কে আরো বেশি নমুনা সমীক্ষা করে আর-একটা পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমরা দ্রুত পেশ করব। কিন্তু যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাও 'মুসলিমদের চার বিয়ে এবং কাঁড়ি-কাঁড়ি বাচ্চার' ধারণাকে নস্যাৎ করবার পক্ষে যথেষ্ট।

লেখাটিকে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ বলাই শ্রেয়। লেখার ধারণাটি স্পষ্ট রূপ পেতে যাঁদের সঙ্গে আলোচনা আমাকে সাহায্য করেছে তাঁরা হলেন অশোক ঘোষ, আবদুর রউফ, কমলেন্দু ধর, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন রায় প্রমুখ। তথ্য সংগ্রহের বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছেন এবং হাতের কাছে সাজিয়ে দিয়েছেন বন্ধু দীপক এবং চুমকি পিপলাই। নমুনা সমীক্ষায় নিজেদের দৈনন্দিন- উপার্জনের কাজ ফেলে যাঁরা এ-কাজে লেগে ছিলেন; তাঁরা হলেন বাঁকড়া অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান, স্বপন মুখার্জী, জামাল লসকর। সেখ স্থলেমান আলী, শেখ তোফাজ্জল এবং বাঁকড়া-অঞ্চলের অনেক বন্ধু অযাচিতভাবেই এ-কাজের শরীক বনে গেছেন। এঁদের সবার যৌথ প্রয়াসকে আমি অক্ষর-শব্দে সাজিয়ে দিয়েছি মাত্র।

বিনীত
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমের উত্তর-আধুনিকতা : একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

"উত্তর-আধুনিকতা" শব্দটি কিছুদিন হল খুব কানে আসছে। এ বিষয়ে নিবন্ধ লিখতে গিয়ে কিছু গ্রন্থ আর প্রবন্ধ পড়ে আমি যা বুঝতে পারলাম আর অনুভব করলাম, তার ভিত্তিতেই এই আলোচনা করছি। আমি এই বিষয়ে আরো নতুন তত্ত্ব আর তথ্য সংগ্রহ করলে আমার বক্তব্য হয়তো পালটাত কিংবা আরো পরিণত হত—কিন্তু শুধু অধীত বিদ্যার উদ্‌গিরণ আমার লক্ষ্য নয়, আমি তার সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছি লেখক হিসেবে আমার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। আমি যা বিভিন্ন বই থেকে আহরণ করেছি তা অচিরেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে পারে, নতুন তত্ত্ব এসে জীর্ণ করে দিতে পারে সাম্প্রতিক তত্ত্বকে, কিন্তু আমার যা উপলব্ধি আর প্রতিক্রিয়া, তা এই মুহূর্তের জন্যে সত্য। এখন পর্যন্ত আমি জানি না আমি শেষ পর্যন্ত কী লিখে উঠতে পারব, আমার আলোচনার প্রতিটি উক্তিকে অভিপ্রেত উক্তি বলে ভাবতে পারব কি না, না আমার লেখার মধ্যেও থাকবে সেই "ধূসরতা" যা সাদাও নয় কালোও নয়, ছাইরঙের কোনো একটা কিছু, যাতে শেষ পর্যন্ত 'এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে'। "বাইনারি লজিক" বিশ্বাস করে এটা ঠিক কিংবা ওটা ঠিক, কিন্তু নব্যতাত্ত্বিকদের কারো-কারো ধারণা যে এই ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তিও নড়বড়ে—আসলে হওয়া উচিত এটা কিংবা ওটা, এটা এবং ওটা এবং অন্য একটা কিছু। এই নব্যন্যায়ের বহুবাদিত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যে যাকে উত্তর-আধুনিকতা বলা হচ্ছে তার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আমি যে ধান ভানতে শিবের গান গাইছি না, তার প্রমাণ হিসেবে আমি একজন পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকের রচনা থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করছি :

'The present is inscribed under erasure ; it is but the mark, the trace of a relation to a future and a past which do not exist as modified presents (before or after) but only 'divide the present in itself.' Whence the relation between the poststructurist critique of being as presence and the peculiar temporariety of the postmodern, of the 'just now' as the 'after now' as mediation, spatialization, incarnate, as it were, in the "secondarity" of writing. To speak of the present as of what is already past is to speak in the mode of the future with regard to it. The postmodern evokes a sense of the present as future and as past with respect to itself, never as present to itself. If the postmodern has a grammatical tense it is decidedly not the present, but the future past, the future perfect'.

বিশুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকে উত্তর-আধুনিকতাকে "future perfect" বলা যেতে পারে তাহলে, কিন্তু তাতেও নানামুনির নানা মতকে ঠেকানো যাবে না—একেক জনে একেক রকম ব্যাখ্যা করবেন। কিছু আগে যে উদ্ধৃতিটি উদ্ধার করেছি, তার রচয়িতার লেখা অনুধাবন করতে-করতে মনে প্রশ্ন উঠেছে যে "just now"-র বদলে "after now" এবং "secondarity" যদি উত্তর-আধুনিকতার চরিত্রলক্ষণ হয়, তাহলে তা বিশেষ কালনির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডের সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে কেন, তা তো যে-কোনো যুগের যে-কোনো কালের সাহিত্য বিষয়েই প্রযোজ্য? আসলে, অধিকাংশ সাহিত্যতত্ত্বের মতো

এই তত্ত্বটিও শুধু একটি অন্তর্দৃষ্টি জুগিয়ে দেয় আমাদের, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তার মূল্যই বা কম কী?

কালগতভাবে, 'উত্তর-আধুনিকতা' বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম প্রশ্ন: আধুনিকতা শেষ হল কখন, যার পরে আরম্ভ হয়েছে উত্তর-আধুনিকতা? এই 'উত্তর-আধুনিকতা' যদি শেষ হয়, তখন কি শুরু হবে উত্তরোত্তর আধুনিকতা ('Post Post modernism'ও শোনা যাচ্ছে আজকাল), এবং এই তরঙ্গোৎক্ষেপ কি কখনো থামবে না? ভার্জিনিয়া উলফ বলেছিলেন যে আধুনিকতা শুরু হয়েছে ১৯১০ সালে বা মানুষের মন এই সময়ে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং আমাকে একজন অধ্যাপক বলেছেন যে আধুনিকতার কালসীমা হল ১৯১০ থেকে ১৯৪৫, এবং তার পরেই সূচনা হয়েছে উত্তর-আধুনিকতার। এই সরলীকরণে কয়েকজনের মানসিক শান্তি বাড়তে পারে কিন্তু আধুনিকতা আর উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে কোনো তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে আমি প্রবন্ধের একেবারে শেষাংশে আমার মন্তব্য জানাব, কিন্তু এখানে এই সূত্রটির অবতারণা করলাম এজন্যে যে কোনো-কোনো তাত্ত্বিক এবং আলোচক বিষয়টিকে গুণগতভাবে দেখতে গিয়ে এক সময়ের লেখার মধ্যে এক ধরনের চরিত্রলক্ষণ আবিষ্কার করেছেন, যা অন্য সময়ের বা পরবর্তী সময়ের সাহিত্যের মধ্যে নেই—সেখানে অন্য লক্ষণ, অন্য চরিত্র, অন্য প্রাণস্পন্দন। প্রথমটিকে বলেছেন আধুনিকতা, দ্বিতীয়টিকে উত্তর-আধুনিক। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকজন লেখক এবং সাহিত্য-তাত্ত্বিকের মতামত আলোচনা করব। প্রথমে নির্বাচন করছি আমেরিকান ঔপন্যাসিক জন বার্থের একটি প্রবন্ধ: 'The Literature of Replenishment: Postmodernist Fiction' বার্থকে (যেমন উইলিয়াম গাস ও জন হাক্সকে) যে উত্তর-আধুনিক বলা হয় সে বিষয়ে তিনি অবহিত, এবং পুরো ব্যাপারটিই ধাপ্পাবাজি না খাঁটি, এ বিষয়ে খোঁজ করতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হ্যাঁ এবং না—খাঁটিও, এবং ধাপ্পাবাজিও. অর্থাৎ যদি এমন কোনো বস্তু কল্পনা করা সম্ভব হয় যা অংশত খাঁটি এবং অংশত ধাপ্পাবাজি তা হলে, বার্থের মতে, উত্তর-আধুনিকতাও তা-ই। "Well, what is post-modernism?' তিনি এই প্রশ্নটি তুলেছেন প্রবন্ধে, এবং এ বিষয়ে যে-ধারণায় পৌঁছেছেন তার দুটি অংশ উদ্ধার করছি এখানে:

'One is reminded of the early James Joyce's fascination with the word gnomon in its negative geometrical sense, the figure that remains when a parallelogram has been removed from a similar but larger parallelogram with which it shares a common corner.'

'The proper program for postmodernism is neither a mere extension of the modernist program, nor a mere intensification of certain aspect of modernism, nor on the contrary a wholesale subversion or repudiation of either modernism or what I am calling premodernism—"traditional bourgeois realism".'

প্রথম উক্তিটিতে একটি গুহ্য জ্যামিতিক নকশার উল্লেখ আছে, যার আবেদন প্রথমত আমাদের চোখের কাছে—কিন্তু এই রূপকল্পটি অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা একটি সাহিত্যিক সত্যের সন্ধান পেতে পারি। দ্বিতীয় উক্তিটিতে তিনি বললেন যে উত্তর-আধুনিকতা আধুনিকতার সম্প্রসারণ নয়, আধুনিকতার কয়েকটি লক্ষণের তীব্রতর প্রয়োগমাত্র নয়, বা প্রাগাধুনিক বা আধুনিকতার বুর্জোয়া বস্তুবাদকে নস্যাৎ করাও নয়। তাহলে, বার্থের মতে, উত্তর-আধুনিকতা কী? বার্থ তাকে একই সঙ্গে অংশত খাঁটি ও অংশত ধাপ্পাবাজি বলেছেন হয়তো এই কারণে যে, উত্তর-আধুনিকতা কী নয় তা তিনি অনুধাবন করেছেন, কিন্তু সঠিক যে

কী সে বিষয়ে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, কিংবা স্পষ্ট ধারণায় আসা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।

Oxford English Dictionary-র মতে, 'আধুনিকতা' শুরু হয়েছে ১৭৩৭ সালে (আলেকজান্দার পোপকে লেখা জোনাথান সুইফ্‌টের একটি চিঠিতে), এবং 'Modernist' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ১৫৮৮ সালে। কিন্তু আমরা যে অর্থে 'আধুনিকতা' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন কি সেই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হত? *American Heritage Dictionary*-তে (১৯৭৩) আছে যে আধুনিকতা হল 'the theory and practice of modern art', *Colombia Encyclopedia*-র মতে, আধুনিকতাকে ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে—'the reinterpretation of Christian doctrine in the light of modern psychological and scientific discoveries.' এতে শুধু বার্থ বিভ্রান্ত হয়েছেন তা-ই নয়, আরো অনেকেই হতে পারেন। বার্থ উল্লেখ করেছেন Irving Howe-এর "The decline of the New", 1969), George P. Elliott-এর "Conversions: Literature and the Modernist Deviation", 1971), অধ্যাপক Gerald Graff-এর "Tri-Quarterly"-তে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ "The Myth of the Post-modernist Breakthrough" এবং "Babbitt at the Abyss"। ওই একই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বার্কলের Robert Alter-এর "Reflections on the Aftermath of Modernism", এবং বিখ্যাত মিশরীয়-আমেরিকান অধ্যাপক ইহাব হাসানের "The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature"। শেষোক্ত বইটি যখন আমি পড়েছিলাম তখন লক্ষ করেছিলাম যে অধ্যাপক হাসানও কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে। তাঁর মত মোটামুটি এই যে, উত্তর-আধুনিকতা অংশত আধুনিকতারই সম্প্রসারণ, অংশত আধুনিকতার বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিক্রিয়া। বার্থ এইসব পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করে এই ধারণায় পৌঁছেছেন যে:

'With varying results, they maintain, post-modernist writers write a fiction that is more and more about itself, and its processes, less and less about objective reality and life in the world.'

রোব গ্রিয়ের একটি উক্তি মনে পড়ল: 'the genuine writer has nothing to say....He has only a way of speaking.'

এর পরেই আলোচনা করছি এক ওলন্দাজ পণ্ডিত ডাওয়ে ফোক্কেমার গ্রন্থ *Literary History: Modernism and Postmodernism*, যা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বই ব'লে মনে হয়েছে। "Modernist Hypothesis" বলে যে অধ্যায়টি আছে তাতে আগের অধ্যায়ের আলোচনার জের টেনে উনি বলেছেন যে, আধুনিকতার মূল চরিত্র-লক্ষণ হচ্ছে ('compositional and syntactical conventions'): (১) the presentation of the text as not being definite or complete; (২) epistemological doubt with respect to the possibility of representing and explaining reality; (৩) metalingual scepsis as to the possibility of expressing adequately whatever knowledge about the world one thinks to have found, এবং (৪) respect for the idiosyncrasies of the reader। তারপরেই ফোক্কেমা প্রশ্ন তুলেছেন যে প্রশ্ন আমরা অনেকেই অনেকবার তুলেছি, কিন্তু যেটি প্রায় অনিবার্য প্রশ্ন—ধারাবাহিকতার প্রশ্ন, উত্তর-আধুনিকতা কি অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো আন্দোলন, নাকি আধুনিকতারই কোনো-কোনো

চূড়ান্ত চরিত্রলক্ষণের একত্রিত প্রবাহ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখছেন যে বরহেস, কোর্ডাজার, মার্কেস, বার্থ, বার্থেলেমে, কুভার, বুডো, বোর-গ্রিয়ে, কালভিনো, পিটার হান্ডকে, বার্নার্ড—যাঁদের উনি উত্তর-আধুনিক বলে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের রচনায় কোনো সামান্য লক্ষণ আছে নাকি? ফোক্কেমা জানিয়েছেন যে উত্তর-আধুনিকতা শুরু হয়েছিল আমেরিকায় এবং ঐ ভূখণ্ড থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশে, কিন্তু এই আন্দোলনের প্রথম দিকে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন লাতিন আমেরিকার বরহেস, যাঁর লেখালেখি শুরু হয় ১৯৩০ থেকে। ১৯৫২ সালে তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে ফরাসিতে, এবং দশ বছর পরে, ইংরেজিতে। এই বিষয়ে ফোক্কেমার একটি মন্তব্য উদ্ধার করছি: Borges, who usually is considered to be highly original, strikingly exemplifies the problem of continuity and discontinuity by translating Virgina Woolf's "Orlando" (in 1937). Borges' preference for the novel, which makes its principal character not only change sex but also live several hundreds of years, is closely linked to his own imaginative treatment of time, which has set a paradigm for Post-Modernism,' আবার এও বলেছেন উনি যে উত্তর-আধুনিকতা হয়তো স্বাধীনভাবেই জন্ম নিয়েছিল ফ্রান্স ও লাতিন-আমেরিকায়, এবং 'in either case it became a powerful code through its acceptance in North America'.

আরেকজায়গায় তিনি আরেকটি মন্তব্য করেছেন: 'Whereas the Modernist aimed at providing a valid, authentic, though strictly personal view of the world in which he lived, the Postmodernist appears to have been abandoned the attempt towards a representation of the world that is justified by the convictions and sensibility of an individual.'

তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ব্যক্তি ও সমষ্টির যে সংস্পর্শ ও দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সমাজকেন্দ্রিকতার কোন্‌টির ওপর ঝোঁক পড়বে তার ওপরে নির্ভরশীল সাহিত্য ও শিল্পের যে চূড়ান্ত প্রকৃতি, তার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে সাহিত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগাযোগের প্রশ্ন, সাহিত্যিকদের সমাজচেতনা, এবং কেন সাহিত্য-রচনার কোনো-কোনো ধারাকে সমালোচকেরা অবক্ষয়ী বলে অবহেলা করেন।

ফোক্কেমার মতে, উত্তর-আধুনিক সাহিত্যে text এবং লেখকের মধ্যে যে সম্পর্ক তা

'Is a much less strained one than in the Modernist Code.'

কোথায় কিভাবে একটা লেখা শুরু হয়েছে তা নিয়ে একজন উত্তর-আধুনিক লেখক আদৌ মাথা ঘামান না, একটি লেখার উপসংহার যে নানাভাবে হতে পারে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন ফাউলসের "The French Lieutenant's Woman" (১৯৬৯), মালামুদের "The Tenants" (১৯৭১), নুটেবুমের "A Song of Appearance and Essence" (১৯৮১)। ফ্ল্যান ওব্রাইনের "At Swim Two Birds"-এ একাধিক উপসংহারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আছে একাধিক আরম্ভ। জন বার্থ তাঁর "Lost in the Funhouse, ১৯৬৮"-এ উপন্যাসকে একই সঙ্গে মুদ্রণ, টেপ ও কণ্ঠস্বরের জন্যে রচনা করলেন। ১৯৭৮-এ প্রকাশিত "ব্যুমেরাং"-এ মিশেল বুডোর একাধিক 'text' কালো, নীল ও লাল রঙে ছাপালেন যাতে পুরো ব্যাপারটাই দুষ্পাঠ্য হয়ে ওঠে। আধুনিক লেখক তাঁর কোনো লেখাকেই

চূড়ান্ত বলে মনে করেন না, আর উত্তর-আধুনিক লেখবার সময়ে লেখা থামিয়ে বলতে পারেন যা হয়েছে তা-ই শেষ। আধুনিক লেখক তবু সুসংযুক্ত পঙক্তি, প্যারাগ্রাফ, অধ্যায় রচনা করেন, কোনো-কোনো উত্তর-আধুনিক লেখক এই সংযোগকে ছিন্ন করেন একটি text-এর ভিতর আরেকটি text-কে ঢুকিয়ে, যেমন কোনো প্রশ্নমালা বা অন্য কোনো text—বার্থেলেমের "Snow White" (১৯৬৭), হানডকে, স্ট্রাউস, হেরমানসের কথা উল্লেখ করেছেন ফোক্কেমা যাঁরা অনুরূপ রীতি ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনায়।

"text" আর "social context"-এর মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে "আধুনিক লেখক" "বাস্তবতা"-র কোনো নিয়মানুগ ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন না, আর "উত্তর-আধুনিক লেখক", অনেকটা উইটগেনস্টাইনের ধারায়, এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার সবরকম চেষ্টাকেই খারিজ করেছেন। উত্তর-আধুনিক বিশ্বাস করেন "the social context consist of words", এবং সব নতুন লেখাই পুনর্লিখিত রচনা—এডমন্ড্ উইলসনই সম্ভবত প্রথম যিনি "palimpsest" শব্দটি ব্যবহার করেছেন জয়েসের রচনা আলোচনা করতে গিয়ে। যে গ্রন্থে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি বহুআলোচিত বহুপঠিত গ্রন্থ "Axel's Castle" (১৯৩১)। উত্তর-আধুনিকরা শব্দ ও শব্দের ক্ষমতায় বিশ্বাসী, শব্দের মধ্য দিয়ে যে নীরবতা আভাসিত হয় বা কবিতার দুটি পঙক্তির মাঝখানে যে অলিখিত পঙক্তি ও 'নীরব' পঙক্তি থাকে (যা এদেশেও কোনো-কোনো কবি ব্যবহার করেছেন, এবং এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা আমার অন্তত চোখে পড়ে নি) তা হল 'আধুনিক'দের এলাকাভুক্ত। ফোক্কেমা এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'The Post Modernist evidently prefers words over silence, logocentrism over Taoism।' কিন্তু যে শব্দের প্রতি তাঁদের আস্থা, সেই শব্দ দিয়েই দুঃসাধ্য পৃথিবী তৈরি করতে চান তাঁরা।

'The Modernist wrote about conceivable, possible worlds, the Post Modernist writes about conceivable, at lest, thinkable, but impossible worlds, worlds that—so reason tells us—can exist only in our imagination'.

কিন্তু আমার বিনীত প্রশ্ন এই যে, উনিশ শতকে র‍্যাঁবো বা বিশ শতকে আপোলেনিয়ের (যে দুটি নাম সঙ্গে-সঙ্গে মনে এল, তারই উল্লেখ করলাম। রোমানটিক কবিদের থেকে শুরু করে সুররিয়ালিস্ট কবিলেখকদের কথা মনে রাখলে আরো অজস্র উদাহরণ বেরিয়ে আসবে) কি এই তথাকথিত অসম্ভবকে সম্ভব করেন নি? ফোক্কেমার যুক্তি ব্যবহার করলে, তাঁরাও তো উত্তর-আধুনিক লেখক হিসেবে গণ্য হবেন।

২

এবার পশ্চিমের উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে আরেকটি সূত্রের অবতারণা করা যাক। মার্কসবাদী আমেরিকান ফ্রেডেরিক জেমসন তাঁর 'The Politics of theory: Idelogical positions in the Postmodernism debate'-এ স্বভাবতই জানিয়েছেন যে পুরো বিষয়টিই একসঙ্গে নান্দনিক ও রাজনৈতিক 'in which the evaluation of the social moment in which we live today is the object of an essentially political affirmation or repudiation', এবং তিনি এ-বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন যে উত্তর-আধুনিকতা বুঝতে হলে সাম্প্রতিক "Consumer Society" ও ধনতন্ত্রের পুর্বতন রূপ যেখান থেকে তা উদ্ভূত হয়েছে তার গঠনগত পার্থক্য বুঝতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে উত্তর-আধুনিকতার সম্পর্ক টানতে গিয়ে তিনি (অন্তত এই প্রবন্ধে) যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে তাঁর

প্রধান প্রতিপাদ্য হল "high modernism" যার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয়েছে উত্তর-আধুনিকতা যা রাজনৈতিক কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক। শুধু সাহিত্য নয়, চিত্রকলা বিষয়েও তাঁর একই বক্তব্য। আমেরিকার বিমূর্ত চিত্র-আন্দোলনকে তিনি বলছেন 'the last high modernist school in painting'। এই সূত্রে চলচ্চিত্র ও গদ্যসাহিত্য বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন যে সরলরৈখিক আখ্যানের অবসান, বাস্তবভিত্তিকতার সমালোচনা, এবং সাধারণভাবে যাকে গল্প বলবার সনাতন ধরন বলা হয় তার বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়াকেও একই ছাতার নীচে কি ফেলা যায়? কিভাবে একজন ব্যাখ্যা করবেন পিঞ্চন, বারোজ, বেকেট, ফরাসিদের nouveau roman বা "non-fiction novel"-কে? আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার সবচেয়ে প্রাণান্তকর সংগ্রাম অবশ্য চলেছিল স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে—এ-বিষয়ে জেমসন কেন, আরো অনেকেই আলোকপাত করেছেন। স্থাপত্যের যে মিশ্রশৈলী ও কোলাজরীতি উত্তর-আধুনিকতার রূপায়ণ বলে চিহ্নিত হয়েছে সে-বিষয়ে প্রবন্ধের শেষাংশে মন্তব্য করবার ইচ্ছে আছে। জেমসন প্রবন্ধের এক জায়গায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বিশ্বখ্যাত হাবেরমাসের মতে,

'The vice of postmodernism consists very centrally in its politically reactionary function, as the attempt everywhere to discredit a modernist impulse.'

রেমণ্ড উইলিয়ামসের পরেই ইংল্যান্ডের যে মার্কসবাদী আলোচক সবচেয়ে আলোচিত, সেই টেরি ইগল্টন তাঁর "capitalism, modernism, and postmodernism" প্রবন্ধে ফ্রেডেরিক জেমসনেরই আরেকটি প্রবন্ধ "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism" (New Left Review)-র সূত্র ধরে বলেছেন যে যদিও জেমসন "parody"-র বদলে "pastiche"কেই উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতির মূল শিল্পরীতি বলেছেন কিন্তু প্যারডিকেও অন্যায়াসে এই সাংস্কৃতির রূপলক্ষণের অন্তর্গত করা যায়:

'What is parodied by postmodernist culture, with its dissolution of art into the prevailing forms of commodity production, is nothing less than the revolutionary art of the twentieth-century avant-garde.'

উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে *Society* পত্রিকার এই বছরেই (১৯৯০) প্রকাশিত আমেরিকান তাত্ত্বিক ডানিয়েল বেলের একটি প্রবন্ধ পড়ে খুব উপকৃত হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমি সব জায়গায় একমত হতে পারি নি কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ (বস্তুত, যাঁদের রচনা আমি এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আলোচনা করেছি তাঁদের কারো সঙ্গেই কি সর্বাংশে একমত হতে পেরেছি?), কিন্তু তাঁর যুক্তিক্রম খুব আকর্ষণীয়। ডানিয়েল বেল ফরাসিদেশের ফুকো এবং আমেরিকার নরমান ব্রাউনের অন্তঃসলিল ("Subterranean") রচনাকেই উত্তর-আধুনিকতার সূচনাভূমি বলেছেন, যাকে ফ্র্যাঙ্ক কারমোড নাম দিয়েছেন "the sense of an ending"। সূত্রগুলি হল, মানুষের অবিনির্মাণ (de-construction), মানবতাবাদের অবসান, এবং (সবচেয়ে বিতর্কিত সূত্র)

'The epistemological break with genitality and the dissolution of focussed sexuality into the polymorph perversity of oral and anal pleasures.'

আধুনিকতা ছিল কল্পনার মুক্তি, উত্তর-আধুনিকতা হল মানুষের দেহের মুক্তি।

সমস্ত বিধিনিষেধকে ওড়াতে চেয়েছিলেন ফুকো এবং নরমান ব্রাউন। সাহিত্যের চেয়েও এই রীতি-লঙ্ঘন সবচেয়ে বেশি কাজে লাগালেন স্থপতিরা, যাঁরা 'আধুনিক ফর্মালিজম'কে পুরোপুরি নস্যাৎ

করলেন তাঁদের কাজে। মাইকেল গ্রেভস মুরিম কল্পনাবিলাসের সঙ্গে মেশালেন বাইজেনটাইন শিল্পরীতি, এবং আধুনিকতার প্রাক্তন প্রবক্তা ফিলিপ জনসন চিপেনডেল ফার্নিচারের মোটিফকে কাজে লাগালেন A. T. V. T. স্কাইস্ক্র্যাপার নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন এভেন্যুতে। বেলের মতে, আধুনিকতার চরিত্রলক্ষণ হল (১) sensation; (২) simultaneity; (৩) immediacy এবং (৪) impact, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন উত্তর-আধুনিকেরা। কোনো সরলীকরণের মতো এই সরলীকরণেও আমার আস্থা নেই, তবে বেল যে যুক্তিতে এই সূত্রগুলি উপস্থিত করলেন তা একেবারে ফেলবার মতো নয়।

সাতকাণ্ড রামায়ণের পরে আমার বিনীত প্রশ্ন হল যে এই আধুনিকতা যদি সংস্কারহীন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা প্রবহমান পরীক্ষানিরীক্ষা-নির্ভর মানসিকতা (যা সাধারণ শিক্ষিত লোকের ধারণা, এবং আমার মতে ভ্রান্ত ধারণা নয়) হয়, তাহলে উত্তর-আধুনিকতা আধুনিকতারই সম্প্রসারণ বা আরেক ধরনের আধুনিকতা। এই আধুনিকতা পাঁচ হাজার বছর আগেও ছিল, আর পৃথিবী যদি টিকে থাকে, তাহলে থাকবে পাঁচ হাজার বছর পরেও। হিল হোমরে, য়ুরিপিদিসের নাটকে, সাফোর কবিতায়, আমাদের দেশের পুরাণ-মহাকাব্যের কোনে-কোনো আখ্যান-আখ্যায়িকায়। সংঘর্ষ আসলে আধুনিকতার সঙ্গে উত্তর-আধুনিকতার নয়—আধুনিকতার সঙ্গে অনাধুনিকতার। সংস্কারচ্ছন্নতার থেকেই জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা, যা শুধু ধর্মের গোঁড়ামিপ্রসূতই নয়—আধুনিক মানুষের আধুনিক না হতে পারার ব্যর্থতা। সাহিত্য চলতে-চলতে যখন বাঁক নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে তখনই জন্ম নেয় আধুনিকতা। দীর্ঘদিন ধরেই এই বহতা নদী কখনো-কখনো বাঁক নিয়েছে, কখনো-কখনো নেয় নি। সমকালীনতা আর আধুনিকতা যে এক নয়, সে তো স্কুলের ছেলেও জানে না—সে হয়তো জানে না যে আধুনিকতা নিয়ে পাঁচজনে পাঁচকথা বলে। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—সবাই সুকবি, কিন্তু আধুনিক মানসতা তাঁদের কবিতায় উপস্থিত নেই বলে তাঁদের আধুনিক কবি বলা যায় না। একই সময়ে একই সমাজে আধুনিক মন ও অনাধুনিক মন একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হলে তো হয়েই যেত—কিন্তু একে অন্যকে গ্রাস করতে চায়, আক্রমণ করে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে যদি কেউ বলেন আধুনিক মানুষের সংখ্যা সমাজে বেশি, তাহলে কিছুই প্রমাণিত হয় না, কেননা প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে হয়তো আধুনিকমানসতাসম্পন্ন লোকেরা অনেক বেশি অগ্রণী। নাকি আমি ভুল বলছি? সম্প্রতিকালের অনেক সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা দেখে মাঝে-মাঝে এই বিশ্বাস টলে যে যায় নি তা নয়, তবে সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে তার কারণ বিশ্লেষণ করলে আবার বহুলাংশে আশ্বস্ত হই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় পশ্চিমের যে টালমাটাল (প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী টালবাহানাও স্মরণীয়) তা-ই অনেকটা পালটে দিয়েছে পশ্চিমের সাহিত্যরীতির চেহারা, চালচলন। আধুনিকতার পাশাপাশি অনাধুনিকতা যে সর্বদা থাকে তা বলা অবশ্য এক হিসেবে ভ্রান্তিকর, কারণ আমি কী করে জানব যে দেড়হাজার দুহাজার পরে মানুষের মনের সার্বিক অবস্থার চেহারা—দেড়হাজার দুহাজার কেন, পনেরো বছর পরেই কী চেহারা নেবে আমাদের মানসিকতা তা বলতে চাওয়াও এক হিসেবে ধৃষ্টতা। তবে সাহিত্যসমাজের অতীত ইতিহাস পড়ে যেটুকু জেনেছি, মানবপ্রকৃতির যে প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে শিল্পকলায়, তার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে আমার তার ভিত্তিতে বলা চলে সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজে এখনও দ্বন্দ্ব চলছে আধুনিকতার সঙ্গে অনাধুনিকতার, আধুনিকতার সঙ্গে উত্তর-আধুনিকতার নয়। উত্তর-আধুনিকতার আলোচনা তা বলে অবান্তর নয়, কেননা

প্রবন্ধের কোনো এক জায়গায় আমি যা লিখেছি, যে-সমস্ত আলোচনা, তত্ত্ববিস্তার, নতুন তথ্যসংযোজন —সবকিছুই সাহিত্য বোঝার পক্ষে একটা নতুন অন্তরদৃষ্টি জোগায়। এবং আমি যেহেতু জীবনবাদী, তাই বলব—শুধু সাহিত্য বোঝবার পক্ষেই অন্তর-দৃষ্টি নয়, জীবনকে বোঝবার পক্ষেও জরুরি।

পশ্চিমী উত্তর-আধুনিকতা সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ এক পশ্চিমী লেখকের (Irving Howe) উক্তি দিয়েই শেষ করছি : "Where the contemporary refers to time, the modern refers to sensibility and style."

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী', ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

মতামত

"ধর্মনিরপেক্ষতা"র ভারতীয় রূপ

পুলকনারায়ণ ধর "চতুরঙ্গ"-র অকটোবর ১৯৯০ সংখ্যায় "ধর্মনিরপেক্ষ ভারত এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের দুর্বলতার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে আমার কাছে দুটো প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুতর বলে মনে হয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন : ১৯৪৯ সালে আমরা সেক্যুলার রাষ্ট্রের সংকল্প নিতে পারলাম না কেন? আর ১৯৭৬ সালে সংবিধানে তার স্থানলাভ আমাদের ভারতীয় মানসিকতায় কোনো অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : মুসলমান সংগঠনগুলি যদি কেবল ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলন না করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আন্দোলন করে, তাহলে মুসলমানদের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্নতি আর প্রসার ঘটবে কি?

প্রশ্ন দুটির মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। সেটি এই : সংখ্যাগুরু হিন্দুরা এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে ফেলেছেন, এখন মুসলিম ভাইয়েরা এগিয়ে এলেই সমাধানের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার জিজ্ঞাসা : আমরা ভারতীয়েরা কোনো দিনই কি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলাম?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর যত দিন না আমরা দিতে পারব, তত দিন পর্যন্ত এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান অসম্ভব। হাজার-হাজার মানুষ 'জয় সিয়ারাম' বলে এখনো কেন পাঁচশ বছরের পুরনো এক মসজিদ ভাঙার জন্যে খেপে উঠল? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। তা না হলে এ জাতির ভবিষ্যৎ নেই। আজ এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বলার সময় এসেছে যে আমরা—এদেশের হিন্দু বা মুসলমান —কোনো দিন ধর্মনিরপেক্ষ ছিলাম না, এখনও নই।

১৯৪৯ সালে সেক্যুলার কথাটা সংবিধানে ঢোকাবার প্রয়োজন হয় নি। কারণ তখন অন্তত কথায়-বার্তায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা প্রয়াস ছিল। কিন্তু পরে দিনের পর দিন সারা ভারত জুড়ে একের পর এক দাঙ্গা সমাজকে কলুষিত করতে থাকে। অপর দিকে, রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা মন্দিরে মসজিদে ধরনা দিতে থাকেন যাতে তাঁদের নির্বাচনী তরীকে কূলে ভেড়াতে পারেন। তখনই প্রয়োজন হল সেক্যুলার কথাটাকে সংবিধানে ঢোকাবার। সংবিধানে সমাজতন্ত্র কথাটাকে বসিয়েও তো আমরা মূলধনী সমাজব্যবস্থার পাহারাদার। তেমনি, সেক্যুলার কথাটা বসিয়েও আমরা ধর্ম-নিরপেক্ষ নই।

এ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে। সোমনাথের মন্দির দিয়েই কথা শুরু করি। এই মন্দির স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যেই নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়—প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সর্দার পটেল আর তখনকার সৌরাষ্ট্র সরকার। সর্দার বলছেন :

The Jamasheb contributed a lakh of rupees. Samal Das *on behalf of the provincial Government* contributed another fifty thousand rupees. ...I went to Calcutta and spoke to some friends there. They have promised to donate about 25 lakhs of rupees. We have secured 21 lakhs already. Our aim is to collect a crore at least. (*Sardar Patel in Tune with Millions*. Ed. G.M. Nandurkar, Vol III, pp 52-53)

সর্দার পটেল কাজটি করেছিলেন একটি ট্রাস্টের মারফত, ঠিকই; কিন্তু কী করে এ কথা ভুলে যাই যে তিনি তখন ভারতবর্ষ-নামক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

সহকারী প্রধান মন্ত্রী। তার চেয়েও মারাত্মক তদানীন্তন সৌরাষ্ট্র সরকারের ভূমিকা—তাঁরা এই কাজে সরকারি তহবিলের পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। পণ্ডিত নেহরু এইসব কাণ্ড দেখে ১৯৫১ সালের ২ মে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাবধান করে দিয়ে একটি চিঠি লেখেন :

You must have read about coming ceremonies at the Somnath Temple. It should be clearly understood that this function is not governmental and the government of India as such have nothing to do with it. We must not do anything which comes in the way of our state being secular. That is the basis of our Constitution and governments. Therefore they should refrain from associating themselves with anything which tend to affect the secular character of our state. (*Letters to Chief Ministers*, Vol II, pp 388-9)

কিন্তু এই চিঠির আবেদন নিষ্ফল হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে আবার লিখতে হল :

Our frequent declarations that we are a secular state are appreciated abroad and raise our credit. The recent inauguration of the Somnath Temple with pomp and ceremony has created a very bad impression abroad about India and her professions [of secularism]. (*Letters to the Chief Ministers*, Vol II, p 462)

আরেকটু পিছিয়ে যাই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক বছর আগে। ভুললে চলবে না—স্বয়ং গান্ধীজী দিল্লির বিরলা মন্দিরের উদ্বোধন করেন। ১৯৩৯ সালের ৩০ মার্চ অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'বিরলাদের বহুলক্ষ টাকার মন্দির দেখে হতাশ্চর্য হয়েছি। এত বড়ো বহুমূল্য মূঢ়তা জীবনে দেখি নি। মূর্তিপূজা কত দূর উগ্র এবং অসুন্দর হয়ে আস্ফালন করতে পারে তার প্রমাণ।···মহাত্মাজী যদি দোতলায় উঠে রক্তাক্ত সুরাসুরের দ্বন্দ্বের ছবি মন্দিরের গায়ে দেখতেন, তাহলে ব্যবসায়ীর সৌখকে ধর্মস্থান বলতে তাঁর উৎসাহ হত না। উনি দ্বারের কাছে বিশ্রাম করে উদ্বোধনপর্ব সারলেন এবং চির-দিনের মতো ওঁর নাম জড়িয়ে গেল ১৯১৯ সালের হিন্দুত্বের সঙ্গে। জহরলালকে সেদিন বললাম। তিনি বললেন, ওই মন্দিরে তিনি যান নি, কোনো দিন যাবেন না। কিন্তু ওঁরাও মুখ খুলতে চান না। ফলে দেশ জুড়ে আবার ধর্মের আদিমতা, আধুনিক হয়ে উঠছে লক্ষ টাকার বণিকদের কৃপায়।'

আরও পিছনে চলে যাওয়া যাক। আমরা এমন একটা ধারণার প্রচার করে আসছি যার থেকে মনে হয় হাজার-হাজার বছর ধরে আমরা আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে রেখেছিলাম বহিরাগতদের বুকে টেনে নেবার জন্য। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলে? যারা এখানে এসে ঠাঁই করে নিয়েছে, তারা তা নিজেদের জোরেই করেছে। আর যাদের আমরা ঠাঁই দিয়ে-ছিলাম, তারা সর্বাংশেই ছিল তখনকার "হিন্দু"দের তুলনায় পিছিয়ে-থাকা। ফলে, উন্নত হিন্দু সমাজের মধ্যে তাদের ঠাঁই হওয়াটা ছিল তাদের পক্ষে এক ধরনের প্রমোশন। তাই, হিন্দু সমাজের জাতপ্রথার মধ্যে তাদের হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে নি।

ঝামেলা শুরু হল যখন তুর্ক-মঙ্গোলরা ভারতে এসে জাঁকিয়ে বসল। হিন্দু সমাজ তখন আর গতি-শীল নেই; সে তখন ডুব দিয়েছে অন্ধতা আর গোঁড়ামির মধ্যে।

তখন হিন্দু সমাজে "ম্লেচ্ছ" শব্দের আসনলাভ স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। তখন সব বহিরাগতই ম্লেচ্ছ। একদেহে লীন হওয়ার ব্যাপারটা ঘুচে গিয়ে, হিন্দু সমাজকে ম্লেচ্ছের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে কল্কি অবতার এসে গিয়েছেন।

মুঘলরা শক বা হুন ছিলেন না।

Muslims were not barbarians at a low level of culture who would consider admission to the Hindu fold as a promotion. On the contrary, not only were they themselves the creators and defenders of a new and aggressive culture, they had a fanatical conviction of its superiority to all others and thought it was their duty to propagate it by force. (Nirad C. Chaudhury, *The Continent of the Circe*, pp 63-4)

●

১৮৮০-র আগে পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হলেও তার ঘনঘন পুনরাবৃত্তি ঘটত না। কিন্তু পরে যখন থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন এসে যেতে লাগল, তখন থেকে দাঙ্গাও সংখ্যায় বাড়তে থাকল। তখন, অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও, দাঙ্গাগুলো প্রধানত হত গোহত্যাকে কেন্দ্র করে :

A rash of rioting over cow-slaughter spread over much of Northern India. Gerald Barrier mentions 15 major riots of this type in the Punjab between 1883-91 and such disturbances reached their climax in eastern U. P. and Bihar between 1888-93, the worst affected being Ballia, Banaras, Azamgarh, Gorakhpur, Arrah, Saran, Gaya and Patna. Serious riots occured also in Bombay city and a number of Maharashtrian towns between 1893-95. (Sumit Sarkar, *Modern India*, p. 60)

এই পরিবেশেই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের জন্ম, এবং সে আন্দোলন এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। বাল গঙ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসবের ডাক দিয়েই ক্ষান্ত হন নি :

Songs written for Ganapati Utsav urged Hindus to boycott the Muharram in which they had freely participated before. (Ibid, p 60)

ওদিকে লালা লাজপত রায় পানজাবে তাঁর "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকায় বললেন : কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের নিয়ে করা হোক। যুক্তপ্রদেশে

On the eve of the 1926 elections, Motilal's old rival Madan Mohan Malaviya formed an independent Congress Party in alliance with Lajpat Rai and Responsive Co-operators with a programme which combined political moderation with uninhibited Hindu communalism. (Ibid, p 233)

মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের বহু আগেই লালা লাজপত রায় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগের কথা বলেন। শুধু মহম্মদ আলি জিন্নাকে দায়ী করে কী লাভ?

১৯২৭ সালের মার্চ মাসে দিল্লির এক সম্মেলনে জিন্না তাঁর বন্ধুদের পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্রের দাবি থেকে সরিয়ে এনে মিলিত নির্বাচন-ক্ষেত্রের ব্যবস্থায় রাজি করান। জিন্নার নেতৃত্বে লীগ নেতারা চেয়ে-ছিলেন—(১) সংখ্যালঘুদের জন্য আসন-সংরক্ষণ, (২) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন, (৩) মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব। ওই বছরের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগ সম্মেলন থেকে তিনি আবার এই প্রস্তাব পেশ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯২৭ মে মাসে জিন্নার প্রস্তাবকে মেনে নিয়েও পরে নানা ঘুরপথে তাকে নাকচ করে দেন।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে এই কলকাতা শহরে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আবার আকুল আহ্বান জানান জিন্না। তিনি বলেন, 'আমরা সকলে এই দেশেরই সন্তান। আমাদের একসঙ্গেই বসবাস করতে হবে।···আমার এই কথাটা বিশ্বাস করুন—হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ না হলে ভারতের প্রগতি হবে না।' (সুমিত সরকার, "মডার্ন ইন্ডিয়া", পৃ ২৩৩)।

জিন্নার প্রস্তাবে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হত বলে আমি মনে করি না, কেননা তা সমস্যার মূলে

পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু জিন্নার সততা সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সবচাইতে লজ্জার কথা—কংগ্রেস জিন্নার প্রস্তাবকে গ্রহণ করেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আর তাঁর প্রস্তাবের চাইতে উন্নত কোনো প্রস্তাব জাতির সামনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

হিন্দু চরিত্রের এই গলদ এ উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো দায়িত্বশীল হিন্দু স্বীকার করেন নি। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে নরেশ-বাবুর মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন : 'একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান আর ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায়, সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব?'

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি 'কেন যে একজনের দুধ বা খেজুররস খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায়। এসব প্রশ্ন করিলে ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া দিতে হয়।' ("হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়", ১৯১৩)।

রবীন্দ্রনাথ আরও বুঝতে পারেন নি 'বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা হয়, এবং সেইটে জোর করিয়া অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজ ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব—অথচ অন্য ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনোনাম দেওয়া যায় না।' ("ছোটো ও বড়ো")

হিন্দু মানসের সংকীর্ণতা তাঁকে নিয়ত পীড়িত করেছে—'হিন্দু-মুসলমানপার্থক্যকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছু কাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।' ("লোকহিত", ১৩২১)।

'অল্প বয়সে যখন জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম আমাদের একজন ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তাপোশে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা। সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্য, আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।' ("হিন্দু-মুসলমান", ১৩৩৮)।

এই বিভেদের দায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে আত্মানুসন্ধানের কথাই বলেছেন : 'মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে, এই তথ্যটাই ভাবিবার বিষয়। কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।'

অপরকে দোষী না করে বিভেদের কারণ কবি নিজেই খুঁজে পেয়েছেন : 'জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, তারপর এদের ডেকে বলেছি, আমার ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ওই জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত কাঁকটার মধ্যে।' ("কালান্তর") তাই তিনি বলেছেন, 'আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে এই সহজ কথাটা এত শাস্ত্রবচন তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বলতে হয়।'

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি—এই সত্য কথাটা বলতে লজ্জা কিসের? হিন্দু নেতারা তো সবাই পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত গণতান্ত্রিকচেতনাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন; কেন তবে তাঁরা এই বিশাল জন-সমষ্টির মাত্র ২৫ ভাগ মানুষকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারলেন না? কারণ একটাই : সেটা হল সুপ্ত হিন্দু মানসিকতা আর হাজার বছরের ইনারশিয়া, যার চাপের কাছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু নেতারা পিছু হটেছেন বারবার—রুখে দাঁড়াতে পারেন নি। আর বেশির ভাগ নেতাই এই উন্নাসিক মানসিকতার শিকার, সেটা সজ্ঞানেই হোক অথবা অজ্ঞানে।

তাহলে, সমাধান কোন্ পথে?

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল—আমরা যতই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করে থাকি না কেন, মুসলমানদের মতোই আমরাও সাম্প্রদায়িক ছিলাম; কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে। ফলে, আমাদের স্বাদেশিকতায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটে নি। আমাদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ সর্বজনীন ভোটাধিকার আর অধিকাংশ লোকের মত অনুযায়ী শাসন। আর এই শাসনের অধিকার অর্জনের জন্য এবং তা বজায় রাখার জন্য খুন-খখম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বুথ-দখল, জাল-ভোট, ভোটার লিস্টে কারচুপি—সবই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা তার মতামতের সম্মানের কোনো স্থানই নেই।

১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭—প্রায় একশ বছর ধরে আমরা বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি সত্যি, কিন্তু তাতে সমাজপরিবর্তনের কথা বিশেষ স্থান পায় নি। বিদেশী শাসনের অবসানটাই মুখ্য ছিল। ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। বিদেশী চলে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় নি।

গান্ধীজীর 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বাস্তবে রূপায়িত করেছি'র দাবিকে রবীন্দ্রনাথ চ্যালেনজ জানিয়ে বলেছিলেন, 'না, আমি তা স্বীকার করতে পারছি না। আপনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সেই ঐক্য এনেছেন। কিন্তু ইংরেজ যখন দেশ ছেড়ে চলে যাবে, তখন সেই ঐক্য কিসের উপর দাঁড়াবে? আপনি আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন—মুসলমান সম্পর্কে বিদ্বেষবিষ কি আপনি সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করতে পেরেছেন? তাই আমি বলছিলাম, যখন ইংরেজরা চলে যাবে, তখন আমাদের কী হবে? (এলমহার্স্টের কাছে রক্ষিত দলিল, "পশ্চিমবঙ্গ", রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৭, অমিতাভ দাশগুপ্ত রচিত "রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদে পেরিয়ে" থেকে উদ্ধৃত) যে গণতান্ত্রিক চেতনা থাকলে বিধর্মীকে সম্মান করা যায়, সেটা আমরা অর্জন করতে পারি নি জাতি হিসেবে—একথা বলার সময় আজকে এসেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তর আজ প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে কি আমরা এমনি ভাবেই থাকব? কোনোদিনই ভারতীয় চেতনায় নিজেদের গর্বিত করতে পারব না? উত্তরটা সহজ নয়। কারণ, এই অচলায়তন ভাঙা আজ জরুরি হয়ে পড়লেও, অত্যন্ত কঠিন। সমস্তার সমাধানের জন্য আমার মনে হয় কেন জানি না—যে এই বাঙালিদের এগিয়ে আসতে হবে। ভারতবর্ষে আর কোনো জাতির পক্ষে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু আর কেউ নয় কেন? কারণটাতে এবার আসছি।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতীয় চেতনার উন্মেষ এই বাঙলাদেশের মাটিতেই হয়েছিল, আর সেই ভারতীয় চেতনাকে এদেশে আজও বাঙালিই বোধ হয় একমাত্র জিইয়ে রেখেছে। কেন আমরা এটাকে রাখতে পেরেছি, তার কারণ—জন্মসূত্রে আমরা ব্রাত্য। হিন্দু-পুরাণ অনুযায়ী আমরা দানবসন্তান। তার ফলেই আমাদের আর্যাবর্তের হিন্দু মানসিকতা একেবারে কবজা করে নিতে পারে নি। তাই আজও আমরা 'মছলিখোর বাঙালি' ওদের কাছে। যেমন বাংলাদেশের মুসলমান পশ্চিম-পাকিস্তানিদের কাছে

ছিল 'শুনে মুসলমান'।

এখানে যুগ-যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করেছে তার লোকাচারকে কেন্দ্র করে। হিন্দু-প্রভুত্ব এদেশে এসেছে অনেক পরে, তার আগে আমরা তন্ত্র, মন্ত্র আর বৌদ্ধিক মানসিকতায় বেঁচে ছিলাম। শঙ্করাচার্যের আগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ পাত্তা বাঙলা-দেশে ছিল না। পরে তা কতটা প্রবল হয়েছিল জানি না। তবে এদেশে পুজো করার জন্যে ব্রাহ্মণ পাওয়া যেত না, এটা জানা আছে। তাই বল্লালসেন এনে-ছিলেন চারজন ব্রাহ্মণ বাঙলার বাইরে থেকে।

মুসলমান এদেশে আসে ১২০৭ সালে বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে। তারা রাজত্ব করেছে ঠিকই, কিন্তু সমাজব্যবস্থায় কোনো ফাটল ধরাতে পারে নি। মোগল আমলেও বাঙলাদেশের শতকরা ৯০ জন বৃহৎ ভূস্বামী হিন্দুই ছিলেন। এদেশের মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য নয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারই তাদেরকে ইসলামের দিকে ঠেলে দিয়েছে – একথা ঐতিহাসিক সত্য। মুসলমান আমলে তারা প্রত্যক্ষ করল ব্রাহ্মণের দাম্ভিকতা কত শূন্যগর্ভ। ইসলামের তরবারির কোপে ব্রাহ্মণ দ্বিখণ্ডিত হলেও পৃথিবী রসাতলে যায় না, নিম্নবর্ণের হিন্দুর প্রথম সেই অভিজ্ঞতা হল। উচ্চবর্ণের হিন্দুর অত্যাচার থেকে শুধু পরিত্রাণ নয়, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এসব সত্ত্বেও সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বা দাঙ্গার খবর বিশেষ পাওয়া যায় না গত শতাব্দী পর্যন্ত। পরবর্তী কালের দাঙ্গাতেও দেখা যাবে উত্তর ভারত বা বহিরাগত মুসলমানের উশকানিতেই এগুলো সংগঠিত হয়েছিল বেশির ভাগ। আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার হবে হালের বাঙালির ইতিহাস ঘাঁটলে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগ হল। আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হল। কিন্তু পাকিস্তানে শান্তি ফিরে এল না। বাঙালির জাতীয়তাবোধকে শেষ করার জন্য কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে তুলেছিলেন প্রধানত হিন্দুপ্রভাবিত বাঙালি জাতীয়তা শেষ করার জন্য। কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে, সেই জাতীয়তাই মাথা তুলে দাঁড়াল পূর্ব-পাকিস্তানে। আর তার নেতা বাঙালি মুসলমান। শুরু হল বাঙলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই দিয়ে, শেষ হল বাঙালি রাষ্ট্র গঠন করে। ইসলামের ইতিহাসে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ইসলামের নামে যথেচ্ছাচারকে প্রথম চ্যালেনজ জানালে কে? নাতারই ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দল। বাঙালি জাতীয়তাবোধের মৃত্যু হয় নি—প্রমাণিত হল।

কাজেই, হিন্দু-মুসলিম মিলন বা জাতীয় সংহতি —যে কথাই আমরা বলতে চাই না কেন, আমাদের আরম্ভ করতে হবে এটি স্বীকার করে যে, আমরা কেউই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলাম না। অতীতেও না, এখনও না। এখন স্বীকার করে নেবার সময় এসেছে যে, এটাকে ত্যাগ করেই আমাদের এগুতে হবে। আর সেটা শুরু করতে হবে এই বাঙলাদেশ থেকেই, রুখে দাঁড়াতে হবে আর্যাবর্তের এই হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে। কারণ, এত হানাহানির মধ্যে, এখনও আমরা এর থেকে অনেকটা মুক্ত।

তবে কাজটা সহজ নয়। 'এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য, তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন-আপন ধর্মের দ্বারা অচলভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করেছে।' (রবীন্দ্রনাথ, "সমস্যা" ১৯২৩)। এত কথা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি—এই উপমহাদেশে যদি কোনো জাতি সার্থকভাবে এই মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, তাহলে তা পারবে একমাত্র এই মছলিখোর হিন্দু আর শুনে মুসলমানের দল। এর কিছুটা প্রমাণ 'শুনে মুসলমান'রা দিয়েছিল ওপার-বাঙলায়। এবার সময় এসেছে আমাদের প্রমাণ দেবার এপারেতে।

প্রশ্ন এই নয় যে, ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকবে কি না? প্রশ্ন: আমরা সত্যিকারের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব কি না এদেশে।

সংবিধানে যাই লেখা থাক না কেন, অন্দরের কথাটা বরাবরই অন্যরকম ছিল। আর সেকথা শোনা গেল খুব জোরের সঙ্গেই ৩০শে অক্টোবর অযোধ্যায়। সেটা হল 'অন্দরকা বাত্ এহি হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়।' আর তাই এত পুলিশ, এত সৈন্যসামন্ত নিয়ে, এত ঢাক-ঢোল পিটিয়েও বাবরি-মসজিদের মাথায় ভাগোয়া ঝাণ্ডা ওড়ানো আমরা বন্ধ করতে পারি নি।

আর অপেক্ষা করার সময় নেই। এই বাঙলা থেকেই আওয়াজ তুলতে হবে এর বিরুদ্ধে, আর সে আওয়াজে সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাড়া দেবে বলেই আমার ধারণা। তাই আবারও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদের চিৎকার ক'রে বলতে হবে—

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

বেণু গুহঠাকুরতা
কলকাতা